ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা

রত্না বসু

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৬

ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা

Bhāṣāvijñān-O-Saṁskṛta Bhāṣā

[কলিকাতা-যাদবপুর-রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীর পাঠক্রম অনুসারে লিখিত]

রত্না বসু এম. এ. স্বর্ণপদকপ্রাপ্তা
[প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক ও গোলোকচন্দ্র ঘোষ স্বর্ণপদক]
অধ্যাপিকা, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা

ডঃ শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম. এ., পি. এইচ. ডি., এফ. এ. এস.
বিভাগীয় অধ্যক্ষ, সংস্কৃত-বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কর্তৃক
আদ্যন্ত পরিদৃষ্ট ও তৎকৃত ভূমিকা সহ

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী রত্না বসু লিখিত "ভাষা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা" গ্রন্থখানি সংস্কৃত অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের বহুদিনের অভাব মিটাইবে বলিয়া আমি মনে করি। নূতন কোর্স চালু হইবার পর সংস্কৃত অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষাতত্ত্ব জানিবার উপযোগী গ্রন্থ ছিল না। তাহারা শিক্ষক মহাশয়দের নোটের উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষা দিত। কিন্তু যাহারা External ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিত তাহাদের ঐ বিষয় দুরধিগম্য ছিল। অনেক ছাত্র ঐ বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়াই পরীক্ষা দিয়া আসিত। শ্রীমতী বসুর পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় সকল ছাত্র-ছাত্রীই উপকৃত হইবে। পুস্তকখানির মধ্যে ভাষাতত্ত্বের সাধারণ নিয়মের (General principles) সহিত সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমতী বসু অনার্স পাঠক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার গ্রন্থখানি লিখিয়াছে। সুতরাং অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের যাহা জ্ঞাতব্য তাহা সকলই পুস্তকখানির মধ্যে পাওয়া যাইবে। কোন কোন অংশে লেখিকা মূলতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহার প্রবন্ধকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। আমার মনে হয় শুধু অনার্সের ছাত্র-ছাত্রী নয় M. A. ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীও এই গ্রন্থ পড়িয়া এই দুরূহ বিষয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। শ্রীমতী বসুর রচনা সরস এবং তাহার বিশ্লেষণভঙ্গী স্বচ্ছ। সুতরাং তাহা কোন ক্রমেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবে না। শ্রীমতী বসু আমার বাল্যবন্ধু শ্রীধ্রুবদাস বসুর কন্যা। তাহার পিতা বিশেষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। শ্রীমতী বসু পিতার বুদ্ধিমত্তা ও মনীষার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। সুতরাং তাহার পুস্তক যে রসোত্তীর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইবে ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দুরূহ বিষয়কে সরস করিয়া সহজ ভাষায় প্রকাশ করা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। শ্রীমতী বসু সেই কৃতিত্বের অধিকারিণী হইয়াছে আমি ইহা নিসংশয়ে বলিতে পারি। আমি এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

১৬ই জানুয়ারী
১৯৭৭ সাল

শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রস্তাবনা

বাক্‌তত্ত্ব নয়, ভাষাতত্ত্ব। যে অনাদিনিধনা ব্রহ্মস্বরূপিণী পরা বাকের তত্ত্বানুসন্ধানে বৈদিক ঋষির মনীষা, জিজ্ঞাসা, আকুলতা, ব্যাকুলতা গভীর দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল, যে দৈবী বাক্ যাঁকে বরণ করেন তাঁকে পরম মহিমামণ্ডিত করেন এবং যায় তার কাছে ধরা দেন না সেই বাক্-এর স্বরূপ অনুধাবন এবং উপলব্ধি ক্রান্তদর্শী ঋষির পক্ষেই সম্ভব। ভাষাতত্ত্বের এই সামান্য আলোচনা মনুষ্যসমাজে সদা-ব্যবহৃত বৈখরী বাকের লোকসাধারণ বিবর্তনের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা'ও আবার নির্ধারিত পাঠ্যসূচী-অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপযোগী নিতান্ত সহজবোধ্য কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব এখানে বিন্যস্ত করার প্রয়াস নিয়েছি। ভাষাতত্ত্ব (Philology) বিষয়টির ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত ; সেই বিশাল পরিধির অন্তর্ভুক্ত সব কটি গবেষণা শেষ হ'য়ে যায়নি। যেটুকু সমাপ্ত হ'য়েছে এবং যে তত্ত্বগুলিকে এখন স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেগুলিও যে সর্বথা অভ্রান্ত তা' নয়। সেই ভ্রান্তিসমূহকে দূর না করলে ভারতীয় সংস্কৃতসংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। 'তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব' নামক অনুমানভিত্তিক বিজ্ঞান অনুসারেই আজ বেদের রচনাকাল, তার সাহিত্যিক মূল্য এবং সাংস্কৃতিক চেতনার পরিমাপ করা হ'চ্ছে। কিন্তু সংস্কৃতের ছাত্র-ছাত্রীরা 'তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব'টিকে নিতান্ত অবহেলার সংগে এবং অগভীর ধারণা নিয়ে অধ্যয়ন ক'রছে। বিষয়টিকে যেভাবে তাদের কাছে পরিবেশন করা হ'চ্ছে তাও তারা অনুধাবন ক'রে উঠছে না ; সুতরাং তার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য, অসম্পূর্ণতা এবং অযুক্তি র'য়েছে তার সম্পর্কে তো তারা বিন্দুমাত্র অবহিত নয়। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা যদি বিষয়টির প্রতি যথার্থ মনোযোগ এবং আগ্রহ অনুভব ক'রে ভবিষ্যতে এবিষয়ে অপেক্ষিত ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার মানসিকতা অর্জন করে ও অযুক্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে ভাষাবিজ্ঞান, তথা সংস্কৃতের ভাষাবিজ্ঞানাশ্রয়ী মূল্যায়নের

ক্ষেত্রে নবতর কোন আলোকপাত করতে উৎসুক হয় তবে আমার গ্রন্থরচনার প্রয়াসকে সার্থক মনে ক'রব। এছাড়া শুনেছিলাম বাংলায় ছাত্রদের বোধের উপযোগী কোন বই না থাকাতে **Philology** নাকি তাদের কাছে নিতান্ত দুর্বোধ্য ও নীরস মনে হয়। সেক্ষেত্রে আমার এই "বালানাং সুখবোধায়" রচিত পুস্তিকা যদি কিছুমাত্র সহায়তা সম্পাদন করে তবে কিছুটা মানসিক তৃপ্তি লাভ ক'রব। আবারও ব'লছি এ গ্রন্থ আমার নিজস্ব অভিমত বা গবেষণার গ্রন্থ নয়। গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহের সংগে আমি নিজে যে সর্বদা একমত তা'ও নয়; এ শুধুই পূর্বাচার্যগণের তত্ত্বসমূহের একত্র গ্রথিত সহজবোধ্য সংকলনমাত্র। এর উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন আগেই উল্লেখ ক'রেছি।

আজ আমার নিজের ছাত্রীজীবনের কথা সবচেয়ে বেশী ক'রে মনে পড়ছে। লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের শান্তাদি, গৌরীদি, শিবানীদি, শান্তিদি—যাঁদের অসামান্য স্নেহপূর্ণ অধ্যাপনা এবং সহযোগিতায় শুধু আমার ছাত্রীজীবন এবং অধ্যয়নের ধারাই নয়, আমার ব্যক্তিগত জীবনও অনেকাংশে প্রভাবিত, তাঁদের প্রতি আমি সর্বাগ্রে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন ক'রছি। কলেজে শান্তিদি এবং গৌরীদির কাছে **Philology** এবং বেদের হাতেখড়ি হ'য়েছিল। ওঁদের বিশিষ্ট অধ্যাপনার ফলেই তখন থেকেই বহু প্রশ্ন এবং ঔৎসুক্য মনকে নাড়া দিয়েছে। আমি তারই প্রতিধ্বনি আমার উত্তরসূরীদের কাছ থেকে আশা ক'রছি। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল আমার ঔৎসুক্যকে কখনও দমন করার চেষ্টা ক'রে আমায় ক্ষুণ্ণ করেননি। এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে তিনি আমাকে অশেষ আনুকূল্য ক'রেছেন। পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী সদা উৎসাহিত করেছেন ছাত্রদের জন্য কিছু লিখতে; এ'লেখা তাঁর আশানুযায়ী হ'য়েছে কিনা জানি না; শঙ্কিত চিত্তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। যে দিক্‌পাল পণ্ডিতবৃন্দের গ্রন্থাবলীর সহায়তায় আমার গ্রন্থরচনার অপপ্রয়াস রূপায়িত হ'য়েছে. তাঁদের প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাচ্ছি। এই গ্রন্থে রোমান বর্ণসমূহের বাংলা প্রতিলিপির বিষয়ে আমি প্রধানতঃ ডঃ সুকুমার সেনের ধারাকে অনুসরণ ক'রেছি। তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আমার

প্রণাম জানাচ্ছি। কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শের জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আশা রাখি যে দেশে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী পাণিনি, প্রাতিশাখ্য রচয়িতা শৌনক প্রভৃতির জন্ম, সেদেশে নিশ্চয়ই এমন যুগোপযোগী ভাষাবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ ক'রবে যাদের মনীষা ও কুশাগ্রধী ভাষাবিজ্ঞানের সঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণার দিগন্ত উন্মোচিত ক'রে তার সংগে যুক্ত বেদ ও বৈদিক-সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ে বিশ্বের মানুষকে সহায়তা করবে।

আমার আত্মীয়-বন্ধু যাঁরাই পাণ্ডুলিপি কপি করা, প্রুফ দেখা এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য ক'রেছেন এবং উৎসাহ জানিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রকাশক শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য এবং মুদ্রণ-কারী শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত-র সহযোগিতা ও আনুকূল্যের জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন এবং ধন্যবাদার্হ। মুদ্রণ-কর্মীদের অনলস পরিশ্রম এবং সহযোগিতার জন্য তাঁদের জানাচ্ছি আমার অভিনন্দন। 'অলমতি বিস্তরেণ'। অসাবধানতাবশতঃ ১৯ পৃঃ আই = ʌi না হ'য়ে ʌu, ৪১ পৃঃ ১১ পংক্তিতে z', z'h স্থানে z̆, z̆h এবং ৮৬ পৃঃ নীচে 'সেসরী' স্থানে 'সৈসরী' মুদ্রিত হ'য়ে গেছে এবং ১৪৪ পৃঃ (১) সূত্রে কধ্যেন্-এর পরে শধ্যৈ-শধ্যেন্ শব্দদ্বয় বাদ প'ড়ে গেছে। তার জন্য সকলের কাছে মার্জনা ভিক্ষা ক'রছি। সকলের কাছে আমার বিনীত নিবেদন—"আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

রত্না বসু

১৮৩, যোধপুর পার্ক,
ক'লকাতা-৬৮
নভেম্বর, ১৯৭৬

গ্রন্থপঞ্জী

T. Burrow—The Sanskrit Language.
Dr. P.D. Gune—An Introduction to Comparative Philology.
Taraporewalla—Elements of the Science of Language.
F. Max Müller—The Science of Language.
P. Thumb—Das Handbuch des Sanskrit.
ডঃ স্বকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।
ঐ —Indo-Aryan and Hindi.
B. K. Ghosh—Linguistic Introduction to Sanskrit.
A. C. Woolner—Introduction to Prākṛt.
Dr. Suniti Kr. Chatterjee—Origin and Development of Bengali Language.
Dr. Sukumar Sen—History and Prehistory of Sanskrit.
C. K. Raja—Prākṛt-Prakāśa.
Gowen—History of Indian Literature.
Winternitz—History of Indian Literature. (Vol. I, Pt. I)
A. B. Keith—History of Sans. Literature.
Dr. Gaurinath Shastri—History of Classical Sanskrit Literature.
W. D. Whitney—The Sanskrit Grammar.
A. A. Macdonell—A Vedic Grammar.
R. Shyamshastri—The Origin of the Devnāgrī Alphabet.
Agarwal—History of Sanskrit Literature.
ডঃ পরেশ চন্দ্র মজুমদার—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ।
Dr. Sukumar Sen—A Comparative Grammar of the Middle-Indo-Aryan.
ভট্টোজী দীক্ষিত—সিদ্ধান্তকৌমুদী।
—পাতঞ্জলমহাভাষ্যম্।
ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা—ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্য ভাষা।
Dr. K. C. Chatterjee—Vedic Selections.

কয়েকটি উদ্ধৃতি

"There is no inborn ability (or disability) in a particular race to utter any particular sound. It is all a question of habit and practice."

"It has frequently been assumed that Linguistics (or 'Philology' as it is used to be called) is a subject of no interest whatever to the average student and that only a few specially gifted persons are capable of mastering or even understanding the subject. There is some element of truth in this assumption, but the fault lies with the books that deal with the subject and not with the subject itself."

"Linguistic Science, in the sense in which it is generally understood, concerns itself mainly with...spoken language."

"...when the language of the Vedic hymns ceased to be spoken, attempts were made to understand the Vedic speech clearly and from that date begins the study of linguistic phenomena in India. This was destined in later ages to produce the most complete grammar and the most exhaustive analysis of any language in the world."

"Gram marians can simplify and regularise language and perhaps stop its growth ; they cannot create language."

"Languages cannot be made in that manner."

"পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম"। "ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম"।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভাষাবিজ্ঞান কী ? তার বিষয় এবং উদ্দেশ্য

ভাষাতত্ত্ব বলতে বুঝি ভাষার তত্ত্ব। তত্ত্ব অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান। ভাষা কাকে বলে ? এ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সরল উত্তর দেবেন—"কেন ? মানুষে তার ভাব প্রকাশের জন্য যে ধ্বনিসমূহকে উচ্চারণ করে এবং লেখে তাই ভাষা !" কথাটা সত্য। কিন্তু ভাষা শব্দটি ব্যাপক অর্থে আরও ব্যঞ্জনাময়। ভাবপ্রকাশ তো শুধু মানুষেই করে না ;—সমুদ্র, নদী, অরণ্য, পর্বত, পশু-পাখী, সকলেই তো বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে আপন আপন ভাবপ্রকাশে মুখর। সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনি তার ভাষা, বিচিত্র মর্মরধ্বনি অরণ্যের ভাষা, নদীর কুলুকুলু-কলতান তার নিজস্ব ভাষা, পর্বতের গম্ভীর-মহিমা তার ভাষা, পাখীর কলকাকলীতে বিহঙ্গের ভাষা রূপ পেয়ে থাকে। শুধু ধ্বনি সৃষ্টি করেই যে ভাষা প্রকাশিত তাও তো নয়। মানুষও অতি প্রাচীন কালে কথা বলতে পারত না। তখন তার ভাষা ছিল চিহ্ন, ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গী, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি। তবে আজ আমরা ভাষার তত্ত্বানুসন্ধান করতে বসে নিশ্চয়ই এই ধরণের ইঙ্গিত বা সংকেত ভাষাকে হিসেবের মধ্যে আনব না। বস্তুতঃ পক্ষে এক্ষেত্রে আমরা ভাববিনিময়ের স্পষ্টোচ্চারিত, সুবিন্যস্ত এবং বুদ্ধিপরিকল্পিত ধ্বনিময় বাহনকেই ভাষা বলে স্বীকার করব। ভাষার মুখ্য উপাদানগুলিকে সাজিয়ে বলতে গেলে তা এইরকম হবে—ভাষা

ধ্বনিময় এবং মানুষের বিশিষ্ট প্রযত্নসাধ্য ; ভাষা অর্থবাহী, তবে সে অর্থ তার সঙ্গে সহজাত নয়। .ভাষাতাত্ত্বিকের মতে ভাষা যদৃচ্ছা-বশতঃ উচ্চারিত ধ্বনির প্রতীকময়। ভাবনার সঙ্গে স্বাভাবিক বা সহজাত সম্পর্ক থাকলে সবদেশের ভাষাই একরকম হ'ত। ভাষার বিশিষ্ট ভাষণ-প্রণালী (syntax) থাকে। ভাষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্বনিসমূহ এক বিশিষ্ট ক্রম নিতে থাকে। ভাষা সম্প্রদায়-নির্ভর। বহু লোকে একটি বিশেষ ভাষা ব্যবহার ক'রলেও তা সর্বজনবোধ্য হয় না।

ভাষাতত্ত্ব একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দ, ইংরাজী 'Philology' শব্দটির বাংলা রূপান্তর। Philology ব'লতে বোঝায় ভাষাবিজ্ঞান। Philology শব্দের সঠিক অর্থ ভাষা-বিচার (study of language)। গ্রীক ভাষায় 'Philos' শব্দের অর্থ 'প্রেমিক' এবং 'logos' অর্থ 'শব্দ' বা 'ভাষা'। সুতরাং Philology শব্দের স্পষ্ট এবং ঋজু অর্থ হ'ল ভাষার প্রতি সহৃদয়তা (love of language); অর্থাৎ হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে ভাষা বা ভাষণ বিষয়ে সঠিক তত্ত্বানুসন্ধান।

এই বিষয়কে আমরা বিজ্ঞান-নামে চিহ্নিত করেছি। কিন্তু এই বিজ্ঞানের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত অল্প-সময়ের মধ্যে বিধৃত। খ্রীঃ ১৯ শতকের পূর্বে এই বিজ্ঞান-বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য আমরা উপস্থাপিত করতে পারিনা। এমন কি আজও এই বিষয়টির নামকরণ নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষিত হয়। Comparative Philology (তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব), Scientific Etymology (বৈজ্ঞানিক নিরুক্তি), Phonology (শব্দ বা ধ্বনিতত্ত্ব), Glossology (অভিধান-বিজ্ঞান) ইত্যাদি বহু নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক Max Müller ভাষা-বিজ্ঞান নামটিকে সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করেন। [তুলনীয় "I myself prefer the simple designation of the science of language."[1]] পণ্ডিতপ্রবর P. D. Gune 'Comparative grammar' (তুলনাত্মক ব্যাকরণ) নামটিকে আমাদের বিষয়ের পক্ষে অসম্পূর্ণ মনে করেছেন এবং Comparative Philology (তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব/ভাষাবিচার) নামটিকে গ্রহণ করেছেন, যদিও এই নামকরণেও কিছু ত্রুটি থেকে যায়। "Comparative grammar is a name less inclusive than Comparative Philology although perhaps less faulty."[2]

এবারে আলোচনা করা যাক আমাদের বিষয়ের অধীতব্য বিষয়, তার উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং পদ্ধতি-প্রসঙ্গে। Philology বা ভাষাবিজ্ঞান একটি ঐতিহাসিক বিজ্ঞান। ভাষা এখানে বিভিন্ন সাহিত্য-অধ্যয়নের মাধ্যম-রূপে মাত্র বিচারিত। মনে রাখতে হবে ভাষাবিজ্ঞানে ভাষাসমূহকে শিক্ষা করা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হ'ল সাধারণভাবে কেবলমাত্র ভাষা অর্থাৎ ভাষণ (Language, speech) বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যালোচনা করা। অন্যথায় প্রত্যেক ভাষাবিজ্ঞানীকে পৃথিবীর প্রায় ৩০০ কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ৩০০০টি ভাষার অধ্যয়ন, পঠন, পাঠন, বাচনভঙ্গী এবং লেখন-পদ্ধতিতে দক্ষ হ'তে হোত। তাতে আমাদের এই বিজ্ঞানচর্চা অবাস্তব এবং অসম্ভব হ'য়ে পড়ত; যদিও জার্মানী এবং ইউরোপের

---

[1] Max Müller—The science of Language : Page—4.

[2] P. D. Gune—An Introduction to comparative Philology. Page—1.

বিভিন্ন স্থানে আজও Philology ব'লতে যে কোন জাতির সাহিত্য-অধ্যয়ন বোঝায়।

ভাষাতত্ত্বের কাজ হোল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা কি, তা কেমন করে মনের ভাবপ্রকাশের বাহন, মাধ্যম এবং অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে উঠল তার পর্যালোচনা করা, তার উৎপত্তি এবং ক্রম-বিকাশের ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলির অনুসন্ধান, তার পরিবর্তনের ধারা ও পদ্ধতির সঠিক বিশ্লেষণ এবং সেগুলিকে সূত্রাকারে পরিবেশন করা, এবং ভাষাসমূহকে আয়ত্তে এনে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলিকে বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা। এইভাবে বিভিন্ন ভাষার অধ্যয়ন, তাদের গঠনপদ্ধতি, ভাষণপ্রণালী, শব্দ-রচনা ইত্যাদির তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং তাদের গোত্র-বিভাগ করা এই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য ব'লেই এই বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান (Philology) না ব'লে সাধারণভাবে 'তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব' এই নামে অভিহিত করা হয়।

এই পর্যালোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় সংস্কৃত, ফার্সী, গ্রীক, লাতিন, কেল্‌টিক, টিউটনিক, শ্লাভীয়, লিথো-লেতিশ, আর্মেনীয়, আল্‌বানীয় ভাষাগুলির মধ্যে ব্যাকরণগত প্রয়োগ এবং শব্দরচনা বিষয়ে পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে হিব্রু, আসিরীয়, আরবী, ঈথিওপীয় এবং সিরীয় ভাষাগুলির অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই ভাষাগুলিকে একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে অনুমান করা কিছু অসঙ্গত নয়। আবার দক্ষিণ আফ্রিকার ভাষাগুলি পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি, যথা তামিল,

তেলেগু, মালয়লম্, কানাড়ী ভাষাগুলি যে এক বিশেষ গোত্রের ভাষা তা বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না।

ভাষাবিদ্-গণ পৃথিবীর ভাষাসমূহকে এইভাবে কয়েকটি বিশেষ গোত্রে বিভক্ত করেছেন—

(১) ইন্দো-ইউরোপীয়, (২) সেমিটিক, (৩) বাণ্টু, (৪) দ্রাবিড়, (৫) দক্ষিণ-আমেরিকান, (৬) মঙ্গোলীয়, (৭) ফিনো-উগ্রীয়, (৮) অষ্ট্রো-এশীয়, (৯) সেমীয়-হামীয়, (১০) বুরু-শাস্কী, (১১) আন্দামানী ইত্যাদি।

ভাষাতত্ত্বের কাজ হোল এই ভাষাগুলির পারস্পরিক সাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধান করা ও তার সঠিক ব্যাখ্যা পরিবেশন করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র সমগ্র মানবসমাজ। ব্যাকরণের মত কোন ভাষার একটি বিশেষ সময়ের প্রয়োগসমূহের বিবরণ বা বিশ্লেষণে ভাষাবিজ্ঞানের কাজ শেষ হয় না। ব্যাকরণ ভাষার বিশিষ্ট রূপ ও পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে, তার ঐতিহাসিক ধারাকে নয়; ব্যাকরণ ভাষার সমকালীন একটি শুদ্ধ রূপ বেঁধে দেবার চেষ্টা করে এবং তার এই প্রয়াস একটি ভাষার স্বক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান ভাষার শব্দগঠন এবং তার রূপপরিবর্তনকে লক্ষ্য ক'রে তার পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক এবং ঐতিহাসিক সূচী প্রস্তুত ক'রতে তৎপর। ভাষাবিজ্ঞান ভাষার পরিবর্তনের পশ্চাৎপট, এবং গভীর কারণ অনুসন্ধান করে এবং বিশ্লেষণ করে। ব্যাকরণে ভাষার ইতিহাস পাওয়া যায় না; ভাষাবিজ্ঞান যে কোন ভাষাকে যখন বিচার করে, তখন তার অতীত ও বর্তমানের ক্রমবিকাশের ধারাপথের নিরিখে তার তত্ত্বকে

উপস্থাপিত করে। ফলে একসময়ের একটি বিশেষ রূপকেই 'শুদ্ধ' ব'লে স্বীকৃতি দেবার কোন আগ্রহ তার নেই। সর্বোপরি ভাষা-বিজ্ঞান কোন একটি ভাষার পরীক্ষণ বা বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমিত নয়; একই ভাষা-পরিবারের একাধিক ভাষা এবং উপভাষার ধ্বনি, রূপ, বাক্যগঠন ইত্যাদির তুলনামূলক তথ্য সংগ্রহ করে তাকে যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সূত্রাকারে উপস্থাপিত ক'রে তার সিদ্ধান্ত নির্ণয় করে। ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা ভাষাতত্ত্বের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেমন ধ্বনি, উচ্চারণ, অক্ষর গঠন, শব্দ রচনা, ভাষণপ্রণালী, বাক্যরচনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ও ভাষাবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই ভাষাবিজ্ঞানের সংগে শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং আমাদের এই বিজ্ঞান একাধারে ইতিহাসাশ্রয়ী এবং তুলনাত্মক; অথবা ইতিহাসাশ্রয়ী ব'লেই এই বিষয় তুলনাত্মক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষাগুলির সাদৃশ্যের এবং বৈসাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধান ও সূত্র উপস্থাপনা আরম্ভ ক'রেছিলেন এদের চেয়েও প্রাচীন একটি একক ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়োজনে। [এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা একটু পরেই দেখা যাবে।] এইভাবেই এশিয়া এবং ইউরোপের প্রধান ভাষাগুলির জননীস্থানীয় একটি ভাষাকে আবিষ্কার এবং তাকে পুনর্গঠন করাই ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রধান কাজ হ'য়ে দাঁড়াল।

সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রসঙ্গের উপসংহার

অধ্যাপক Whitney-র বক্তব্য দিয়ে করা যাক—"Our science strives to comprehend language, both in its unity, as a means of human expression and as distinguished from brute communication, and in its internal variety of material and structure. It seeks to discover the cause of the resemblances and differences of languages and to effect a classification of them, by tracing out the lines of resemblance and drawing limits of difference."

এই প্রসঙ্গে ভাষা এবং উপভাষার (dialect) পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। আগেই বলেছি, ভাষা মানুষের মনোভাবনার সুপরিকল্পিত, ধ্বনিময়, স্পষ্টোচ্চারিত বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী সমন্বিত বাগ্‌ব্যবহার। এই ভাষা পরম্পরাগত এবং সামাজিক গোষ্ঠী-নির্ভর। ভাষা অত্যন্ত ধীর এবং ধারাবাহিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করা সম্ভব। ভাষা প্রত্যক্ষগোচর এবং ইচ্ছানুযায়ী মানুষ তাকে পুনঃপ্রয়োগ ক'রতে পারে। উপভাষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তা ওই বিশেষ গোষ্ঠীর বহির্ভূত একই ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষের কাছেও দুর্বোধ্য। যদিও স্পষ্টোচ্চারণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি ভাষার মত উপভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

Ref. An Introduction to Comparative Philology. P. D. Gune.
The Science of Language Max Müller.
The Sanskrit Grammar W. D. Whitney.
সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার।
ভাষার ইতিবৃত্ত ডঃ সুকুমার সেন।
Elements of the Science of Language Taraporewalla

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সংস্কৃতের ভূমিকা

ভাষাবিজ্ঞান কাকে বলে তার পর্যালোচনা সমাপ্ত হ'য়েছে। তার ক্ষেত্র নিরীক্ষণও সংক্ষেপে বিচারিত হ'ল। এবারে দৃষ্টি দেওয়া যাক তার ইতিহাসের দিকে। গোড়ায় বলেছি এই বিজ্ঞানের ইতিহাস খুব দীর্ঘ দিনের নয়। বহুদিন ধ'রেই ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে জার্মানীতে বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ইউরোপীয় ভাষাগুলির ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বর্তমান কয়েকটি সাধারণ ধ্বনিগত ও রূপগত সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে তাঁরা অনুমান করেন এই ভাষাগুলি নিশ্চয়ই অধুনালুপ্ত কোন একটি প্রাচীন ভাষা হ'তে উদ্ভূত, যার ফলে তাদের মধ্যে ধ্বনিগত এবং বৈয়াকরণপ্রয়োগগত এই সাদৃশ্য লক্ষিত হচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁরা বিষয়টির নামকরণ করেছিলেন "তুলনাত্মক ব্যাকরণ" (Comparative grammar)। কিন্তু উনবিংশ শতকের শুরুতে বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিকাশের সঙ্গে এই বিজ্ঞান 'তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' নামে চিহ্নিত হ'ল। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য-ব্যাকরণ এবং শব্দভাণ্ডারের দিগন্ত উন্মোচিত হওয়া।

বিষয়টার একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সপ্তদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বাইরের পণ্ডিতগণ (১১ শতকে আল্-বেরুণি ; ১৩২৫ শতকে ইব্ন্ বতুতা প্রভৃতি) ভারতের আচার, ব্যবহার এবং সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাগুলির আবিষ্কারেই অধিক আগ্রহী ছিলেন, ভারতের ভাষা ও সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ ছিল অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত। কিন্তু ১৭ শতাব্দী হ'তে বিভিন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অবশ্য স্মরণীয়। ১৬৩১ থেকে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক Rodger লিখিত 'An open door to hidden Heathendom' গ্রন্থটি শুধু ভারতের জাতিভেদ প্রথার বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি ; এই পুস্তকে গ্রন্থকার প্রকৃতপক্ষে বেদের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তার ভাষাগত বিশ্লেষণ এবং সাহিত্যিক তত্ত্ববিষয়ে আলোচনা করেন। ভর্তৃহরির কিছু গীতিকাব্যধর্মী শ্লোকও তিনি অনুবাদ করেন। এর প্রায় ৫০ বছর পরে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন জার্মান ধর্মযাজক Hanxleden। বইটি মুদ্রিত হ'য়েছিল এরও অনেক পরে এবং বর্তমানে গ্রন্থটি রোমে মুদ্রিত দুইটি ব্যাকরণগ্রন্থের মধ্যেই বিদ্যমান। বেশ কয়েকজন ইংরেজ পণ্ডিতের সংস্কৃতচর্চার অপূর্ব নিদর্শন এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখযোগ্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে তাদের শাসনপদ্ধতির সুবিধার্থে Nathaniel Halhed ফার্সী থেকে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Charles Wilkins ভগবদ্গীতার সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে H. H. Wilson একটি সংস্কৃত

অভিধান প্রস্তুত করেন এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঋগ্বেদ অনুবাদ করেছিলেন।

১৯ শতকের প্রারম্ভে জার্মান পণ্ডিতবৃন্দের এক গোষ্ঠী এই গবেষণায় আত্মনিয়োগ ক'রে ভাষাচর্চার দিগন্তকে আরও প্রসারিত করে দিলেন। তাঁদের মধ্যে Schlegel-ভ্রাতৃদ্বয়, Herder, Franz Bopp, Lassen এবং Rudolph Roth-এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ফ্রিডরিখ্ ফন্ শ্লেগেল-রচিত "Über die Sprache und Weisheit der Indien" (ভারতবর্ষের ভাষা এবং জ্ঞান প্রসঙ্গে) একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। আগষ্ট উইল্‌হেল্‌ম্ ফন্ শ্লেগেল (১৭৬৭—১৮৪৫) ভগবদ্গীতা অনুবাদ করেন এবং সম্পূর্ণ রামায়ণ সম্পাদিত করেন। ফ্রান্‌ত্‌স্ বপ্ (১৭৯১-১৮৬৭) প্যারিসে সংস্কৃত চর্চা করেন এবং তাঁকে 'তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' বিষয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং অত্যন্ত অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশকারীরূপে চিহ্নিত করা যায়। ক্রিশ্চিয়ান্ ল্যাসেন সংস্কৃতভাষায় রচিত নাটকগুলির কিছু কিছু অনুবাদ করেন। রুডল্‌ফ্‌ রথ্ বেদের সাহিত্য এবং ইতিহাসের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে A. Weber "History of Indian Literature" (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস) রচনা করেন।

শুধু ফরাসীরূপে নয় সমগ্র ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে ফরাসী পণ্ডিত ইউজেন বার্ণুফ-এর (১৮০১-১৮৫২) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর খ্যাতনামা শিষ্যদের মধ্যে জার্মানীর Prof. Friedrich Max Müller এবং Theodor Aufrect-এর (ফ্রিডরিখ ম্যাক্স ম্যূলর এবং থেওডোর আউফরেখ্‌ট্‌) গবেষণা এবং গ্রন্থ-

সম্পাদনা বিশেষ উপযোগী হ'য়ে দাঁড়ায়। এঁরা যথাক্রমে ১৮২৩ হ'তে ১৯০০ এবং ১৮২২ হ'তে ১৯০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। ম্যাক্স ম্যূলর ভারতের বৈদিক সাহিত্য এবং দর্শন গ্রন্থগুলির সম্পাদনা এবং মুদ্রণ সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত হ'ন নি, তাদের অনুবাদ, টীকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতিও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বিশ্বের শিক্ষাবিদ্ এবং ভাষাবিদ্‌গণের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের গবেষণা ও মূল্যায়নে এবং পাশ্চাত্যের সম্মুখে প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের মহিমা কীর্তনে ম্যাক্স ম্যূলরের অবদান অবিস্মরণীয়।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকাবাসীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অপেক্ষাকৃত স্বল্প বলে মনে হয়। কিন্তু তার মধ্যেও W. D. Whitney (১৮২৭-১৮৯৪)-র অবিস্মরণীয় কীর্তি তাঁর রচিত "The Sanskrit Grammar" (সংস্কৃত ব্যাকরণ) গ্রন্থটি। ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রথম তিনি এই বিষয়ে উৎসাহিত হন ; তারপরে তিনি জার্মানীতে বেশ কয়েক বছর যাবৎ সংস্কৃত ভাষা ওসাহিত্যের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং অবশেষে ইয়ালে (Yale)-তে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগত এবং শব্দরূপ ও বৈয়াকরণ প্রয়োগগত প্রতিটি খুঁটিনাটির অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ সত্যই বিস্ময়াবহ। তাঁর সমকালীন যুগে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্‌রূপে সর্বত্র সম্মানিত হ'য়েছিলেন। অপর একজন উল্লেখযোগ্য আমেরিকান ভাষাবিদ্ Maurice Bloomfield। অথর্ববেদের উপর তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার তুলনা নেই।

এইভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে উক্ত গবেষণাসমূহের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যখন সংস্কৃত ভাষা, তার গঠন, ব্যাকরণ, রূপতত্ত্ব (Morphology) ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হ'লেন তখন তাঁরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করলেন, যে সাদৃশ্য তাঁরা ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন সেই সাদৃশ্য এশিয়ার ভাষা সংস্কৃতের মধ্যেও বর্তমান। সুতরাং তাঁদের ভাষাভিত্তিক এবং ব্যাকরণবিষয়ক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হোল। ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হোল। এবারে তাঁদের গবেষণা কেবলমাত্র ব্যাকরণগত প্রয়োগগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না; সামগ্রিকভাবে সব ভাষাগুলির ধ্বনিগত, রূপগত, শব্দার্থগত এবং বাক্যগত বিশ্লেষণ, তাদের কারণ অনুসন্ধান এবং ক্রমবিবর্তনের ধারাপথকে আবিষ্কারের অভিনব কর্মে তাঁরা আত্মনিয়োগ করলেন। এবং এই অবস্থায় তাঁরা পূর্বের অনুমানটিকে প্রশস্ততর করে এই বক্তব্য দৃঢ়তার সংগে উপস্থাপিত করলেন—ইউরোপীয় এবং এশীয় ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনুমান করা যায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় ভাষাগুলিই নয়, সেই সংগে এশীয় ভাষাগুলিও একটি একক ভাষা হ'তে উদ্ভূত। অতি প্রাচীনকালে এই সবগুলি ভাষা-ভাষীই একই ভাষা গোষ্ঠী এবং সামাজিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে কোন কারণবশতঃ তারা পরস্পর বিযুক্ত হ'য়ে পড়েছিল এবং আপন আপন ভৌগোলিক সীমানার মাঝে মূল ভাষাকে ক্রমশঃ কিছু পরিবর্তিত ক'রে ফেলেছে। শুরু হ'ল তাঁদের সেই মূল ভাষার স্বরূপ পুনর্গঠন,

এবং এই ভাষাগুলিকেও পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিকভাবে তাদের তুলনামূলক ভাষা-বিচার। সেই কারণে এই স্তরে ভাষা-চর্চার নাম আর 'তুলনাত্মক ব্যাকরণ' থাকল না, কারণ তা অনেকটাই বিবরণধর্মী, তাঁরা তাঁদের বিষয়ের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন—'তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' যা ভাষাসমূহের ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারাপথের প্রবাহের নিরিখে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের নিরীক্ষণে উৎসর্গীকৃত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আবিষ্কার ও পরিচয়ের সাথে সাথে প্রতীচ্যের ভাষাবিজ্ঞান চর্চার এক আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। এই গবেষণার ধারা এক নতুন মোড় নিল এবং নবরূপে রূপায়িত হ'য়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে পরিচালিত হ'ল। অন্যথায় ইউরোপের গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, গথিক, ইতালীয়, শ্লাভীয় এবং এশিয়ার সংস্কৃত, তুখারীয় এবং ফার্সী-ভাষার মধ্যে ঐতিহাসিক বন্ধনের সূত্র কোনদিনই আবিষ্কৃত হ'ত না। এক কথায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা চর্চা, যা বর্তমানে ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণার প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে তা'ই রূপায়িত হ'তে পারত না। **"The discovery of the Indo-European family was a direct result of the discovery of Sanskrit language and literature by European scholars towards the close of the eighteenth century।"**[1] তাই ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতীচ্যে সংস্কৃতচর্চার গুরুত্ব অসীম। **"The greatest linguistic discovery of the 19th century and perhaps of all time was the discovery**

---

[1] **The Sanskrit Language T. Burrow.**

of the IE family of languages. This is hardly less important in the sphere of Philology than the discovery of America in the sphere of Geography."[2] ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধনী ভাষণে সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণার নূতন ধারা আবিষ্কারকে লক্ষ্য ক'রে স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ বলেন ইউরোপীয় গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার সংগে তার সাদৃশ্য কখনই ঘটনাচক্র হ'তে পারে না। অবশ্য গ্রীক্‌ ভাষার চেয়েও তার ভাষাগত কাঠামো অনেক বেশী নিখুঁত, এবং ল্যাটিনের চেয়েও তা অনেক বেশী সমৃদ্ধ ; তৎসত্ত্বেও ধাতু এবং ব্যাকরণ-এর প্রয়োগমূলক পারস্পরিক সাদৃশ্য কখনও আকস্মিক নয়। "The sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure ; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either ; yet bearing to both of them a stronger affinity both in the roots of verbs and the forms of grammar, that could possibly have been produced by accident."*

এই দৃঢ় প্রত্যয় ইঙ্গিত দেয়, এই ভাষাগুলি অতি প্রাচীন-কালে একই ভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং এই ভাষাগুলির সদৃশ ভাষা কেলতিক, ইতালীয়, গথিক এবং আবেস্তীয় ভাষাকেও তাদেরই অন্তর্গত বলে ধারণা করায় কোন ত্রুটি সম্ভবতঃ নেই। এইভাবে ১৯ শতকের প্রারম্ভে প্রতীচ্যের প্রাচীন ব্যাকরণ চর্চা

[2] Religion of the Ṛgveda. Griswold. Page 2

* T. Burrow, The Sans. Lang.-এ উদ্ধৃত।

পর্যবসিত হ'ল এক অভিনব ভাষাচর্চা তথা ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রধান ভাষাগুলির জননীস্থানীয় সেই মূল প্রাচীন ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে, এই ভাষাগুলির মধ্যে তার ক্রম-বিবর্তনের ঐতিহাসিক বিবরণপঞ্জী নির্ণয়ে ও তার বিশদ বিশ্লেষণে। সেক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। **"The whole science of linguistics have come into existence as a result of the stimulus provided by the discovery of Sanskrit."[৪]**

Ref. **Hist. of Indian Literature. Gowen.**
The Sans. Language. Burrow.
The Science of Language. Max Müller.
Hist. of Sans. Lit. Agarwal.

---

[৪] **The Sanskrit Language T. Burrow.**

তৃতীয় অধ্যায়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিভাগ

যে মূল ভাষা উল্লিখিত হ'ল তার সাধারণ নাম দেওয়া হ'য়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় ২৬টি ভাষা-পরিবারের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীই ভাষাতত্ত্ব-বিদের কাছে সর্বাধিক সমাদৃত। তার কারণ—প্রথমতঃ, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকেরও বেশী মানুষ এই ভাষায় কথা বলে থাকে এবং এই ভাষাপরিবারের অন্তর্গত ভাষাগুলিতেই পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্য রচিত এবং সব দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত এবং সমৃদ্ধ রচনা-সমূহ ওই ভাষাগুলিতে রচিত। দ্বিতীয়তঃ, এই ভাষাগোত্রকে কেন্দ্র করেই ভাষাতত্ত্বের জন্ম এবং বিকাশ। এমন বিস্তৃত এবং বিজ্ঞানসম্মত গবেষণাধারা অন্য কোন ভাষাপরিবারকে নিয়ে হয়নি বললেই চলে। তৃতীয়তঃ, এই গোষ্ঠীর ভাষা-ভাষীরাই আধুনিক সভ্যতার সর্ববিষয়ের পুরোধা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির জননীস্থানীয় এই আদিম বা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্ভবতঃ (অবশ্যই প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের অভিমত অনুসারে) খ্রীঃ পূঃ ২৫০০/৩০০০ বছরে তার যৌবনকাল অতিবাহিত করে পরবর্তী কালে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু এই ভাষা-ভাষীরা বিভক্ত হ'য়ে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং প্রশ্ন আসে ই-ইউ-ভাষাপরিবারের আদি

বাসস্থান কোথায় ছিল? এশিয়ার ভাষাগুলির (অবেস্তীয় এবং আর্য-সংস্কৃত) প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করে পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন এই বাসভূমি মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলেই ছিল। অপর একদল বিশেষজ্ঞ ইউরোপে বিদ্যমান ভাষাগুলির সংখ্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইউরোপেই এই প্রাচীন নীড়ের সন্ধানে তৎপর। মধ্য এশিয়াতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তুখারীয় ভাষার আবিষ্কারের পর থেকে মূল ই-ইউ ভাষা-গোষ্ঠীর আদি-বাসভূমি এশিয়াতেই—এই মতবাদ নতুন ক'রে ভেবে দেখা হ'চ্ছে। স্মুতরাং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিতর্কের অবসান আজও হয়নি। তবে ইন্দো-ইউরোপীয়দের সম্ভাব্য প্রাচীন বাসস্থান হ'ল (১) মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল, (২) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং উত্তর জার্মানীর সংলগ্ন অঞ্চল, (৩) হাঙ্গেরীর সমভূমি, (৪) কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী ইউক্রেনীয় তৃণভূমি অঞ্চল।

মূল ই-ইউ ভাষা সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন এই ভাষার কোনরকম নিদর্শন আমাদের হাতে নেই। স্মুতরাং এই ভাষার যে বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত তা সম্পূর্ণভাবে অনুমানভিত্তিক। স্মুতরাং তার সন্ততি স্থানীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনা করেই তার ধ্বনি-বর্ণ-শব্দ-গত বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপিত হ'য়েছে। যে পদ্ধতিতে এই তুলনাত্মক বিশ্লেষণ সম্পাদনা করা হয়েছে তার বিবরণস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক। উদাহরণ—

	সংস্কৃত	গ্রীক	ল্যাটিন	ইংরাজী	গথিক	জার্মান	ফরাসী
১।	পিতা	patēr	pater	father	fadar	vater	pèere
		(পতের্)	(পতের্)	(ফাদার্)	(ফাডার্)	(ফাতের্)	(পের্)

এই ক্ষেত্রে অনুমান করা হয় মূল ই-ইউ ভাষাতে শব্দটি ছিল *pəter (পতের্)। মূল ভাষার শব্দগুলি অনুমিত এবং পুনর্গঠিত বলে সেগুলিকে সর্বদাই তারকাচিহ্নিত রূপে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে—

	সং.	গ্রী.	ল্যাটিন	ইংরাজী	জার্মান	ফরাসী	মূ. ই. ইউ.
২।	মাতা	মাতের্	মাতের্	মাম্বর	মুটার্	মের্	মাতের্
		(mātēr)	(māter)	(mother)	(mutter)	(mère)	*(mātēr)

৩।	সং.	ভ্রাতা	৪।	সং.	দশ
	গ্রী.	ফ্রাতের (phrātēr)		গ্রী.	দেকা (deka)
	ল্যা.	ফ্রাতের্ (frāter)		ল্যা.	দেকেম্ (decem)
	ইং.	ব্রাদার্ (brother)		ইং.	টেন্ (ten)
	গথিক	ব্রোথার (bröθar)		গ.	তাইখুন্ (taiλun)
	জার্মান	ব্রুডার (brüder)		জা.	ত্সেহ্ন্ (zehn)
	ফরাসী	ফ্রের্ (frère)		ফ.	ডি (dix)
	মূ. ই. ইউ.	*ভ্রাতের্ (bhrātēr)		মূ. ই. ইউ.	*dekm̥ (দেকৃ্ম্)
৫।	সং.	দ্বৌ	৬।	সং.	ভরামি
	গ্রী.	দুও (duō)		গ্রী.	ফেরো (phērō)
	ল্যা.	দুও (duo)		ল্যা.	ফেরো (fero)
	ইং.	টু (two)		ইং.	বীয়ার (bear)
	গ.	ত্বাই (twai)		গ.	বইরা (baira)
	জার্মান—	ত্সোয়াই (zwei)		মূ.ই.ইউ.	*√ভের্ (bher)
	ফরাসী—	দ্যু (deux)			
	মূ.ই.ইউ.	*দ্বৌ (dwōu)			

ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাগুলির ব্যাকরণ ও ধ্বনিগত পর্যালোচনা ক'রে মূল ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে নির্ণীত হ'য়েছে।

(১) ধ্বনিগত—

(ক) মূল ভাষার স্বরধ্বনিগুলি ছিল হ্রস্ব অ, এ, ও, ই, উ (a, e, o, i, u) এবং দীর্ঘস্বর আ, এ, ও, ঈ, ঊ (ā, ē, ō, ī, ū)। এছাড়া অতিরিক্ত অতিহ্রস্ব স্বর একটি ছিল; তার নাম শোয়া (schwa)—(ə)।

(খ) অর্ধব্যঞ্জন (sonants) হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ঋ, ঌ (ṛ, ḷ) এবং ৠ, ৡ (r̥̄, l̥̄);

(গ) অর্ধব্যঞ্জন অনুনাসিক (sonant nasals) হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ন্ (n̥, n̥̄) এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ ম্ (m̥ m̥̄)।

(ঘ) অর্ধস্বর ছিল য়্ এবং ব্ (semi vowels i̯, u̯, পরবর্তী-কালের > য়্, ব্)।

(ঙ) সন্ধ্যক্ষরগুলিও হ্রস্ব ও দীর্ঘভেদে দুই প্রকার ছিল।

হ্রস্ব: অই, এই, ওই, অউ, এউ, ওউ (ai, ei, oi, au, eu, ou)

দীর্ঘ: আই, এই, ওই, আউ, এউ, ওউ (āu, ēi. ōi, āu, ēu, ōu)

(চ) মূল ভাষার ব্যঞ্জনগুলি স্পৃষ্ট, উষ্ম, তরল (plossives, fricatives and liquids) ভেদে ত্রিবিধ। স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনসমূহ আবার কণ্ঠ্য (guttural), দন্ত্য (dental) এবং ওষ্ঠ্য (labial) এই তিনভাগে বিভক্ত। কণ্ঠ্যবর্ণগুলিকে আবার কণ্ঠ্য বা পুরঃকণ্ঠ্য (palatal guttural), পশ্চাৎকণ্ঠ্য (velar) এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য (labio-velar) এই তিন-

ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। সুতরাং ই-ইউ ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে সাজিয়ে লিখলে তা এইরকম হবে ঃ—

১. পুরঃকণ্ঠ্য বা কণ্ঠতালব্য ঃ ক্́, খ্́, গ্́, ঘ্́, ঙ্́ (k̑, k̑h, g̑, g̑h, ṅ̑)
   পশ্চাৎকণ্ঠ্য ঃ ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ (q, qh, g, gh, n̄)
   কণ্ঠৌষ্ঠ্য ঃ ক্ব্, খ্ব্., গ্ব্, ঘ্ব্., ঙ্. (q^w, q^wh, g^w, g^wh, ṅ)

২. দন্ত্য ঃ ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ (t, th, d, dh, n)

৩. ওষ্ঠ্য ঃ প্, ফ্ ব্, ভ্, ম্ (p, ph, b, bh, m)

৪. উষ্ম ঃ শ্, জ্., ঝ্. (ś, z′, z′h)

৫. তরল { কম্পিত (trilled) র্ (r)
   পার্শ্বিক (lateral) ল্. (l)

এছাড়া অতিরিক্ত শিষ্ধ্বনি (sibilant) স্ (s) ও স্বীকৃত হ'য়েছে। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির θ এবং δ (থ্, দ্)-এর অস্তিত্বও অনুমান করা হয়। ই-ইউ স্বরধ্বনিগুলি গ্রীক ভাষায় সর্বাধিক সঠিকভাবে সংরক্ষিত হ'য়েছে এবং তার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সংস্কৃত ভাষায় সবচেয়ে বেশী অবিকৃতভাবে রক্ষিত হ'য়েছে।

(২) রূপতত্ত্বগত (morphological) বিচারে বলা যায় মূলভাষার ব্যাকরণ বেশ জটিল ছিল। শব্দরূপে এবং ধাতুরূপে অজস্র বৈচিত্র্য অবশ্যই ছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ গ্রীক এবং সংস্কৃত ভাষার শব্দরূপ এবং ধাতুরূপগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে এই অনুমানকে খুব অযৌক্তিক মনে হয় না। মূল ভাষায় তিন লিঙ্গ, তিন বচন ও সম্বোধন ও সম্বন্ধপদসহ আটটি কারক বিভক্তি-রূপ ছিল। ধাতুরূপে বর্তমান, তিন প্রকার অতীত, ভবিষ্যত্, সম্ভাবক (potential বা

optative), অনুজ্ঞা (imperative) অভিপ্রায় (লেট্, subjunctive) এবং নির্বন্ধ (injunctive) ইত্যাদি বহুপ্রকার কাল ও ভাব ছিল। এছাড়াও অসমাপিকার নানা ভাব অবশ্যই ছিল (infinitive and gerund)। ধাতুরূপে তিন পুরুষ ও তিন বচন ছিল।

মূল ভাষার স্বরেও (accent) বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। গ্রীকে এবং বৈদিক সংস্কৃতে তার পরিচয় লক্ষ্যণীয়। আধুনিক ভাষার মধ্যে ফরাসী, ফার্সী এবং রুশ ভাষাতেও স্বর-প্রয়োগ (accent) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একই শব্দের বিভিন্ন বর্ণের উপর স্বরভেদে তার অর্থ ভিন্ন হ'য়ে যায়। সমাস গঠনও মূল ভাষায় ছিল।

নাম ধাতু ও প্রত্যয়ের সংমিশ্রণে (inflexion) তাদের স্বরবর্ণের ক্ষয়-গুণ-বৃদ্ধি অর্থাৎ স্বরক্রম বা অপশ্রুতি (vowel gradation বা ablaut) ই-ইউ ভাষার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তার নিদর্শন তার উপভাষাগুলির মধ্যে সহজেই লক্ষ্যণীয়ঃ

তুলনীয় সং. √কৃ > কৃত, করণ, কারণ ইত্যাদি
ইং. sing — sang — sung,
জার্মান gehen—ging—gegangen (√gehen = যাওয়া)

পূর্বে বিদগ্ধ সমাজ রায় দিতেন মূল ই-ইউ ভাষার উপভাষা অর্থাৎ সন্ততিস্থানীয় ভাষাগুলির সংখ্যা নয়। বিংশ শতকের গোড়ায় হিট্টাইট ভাষার আবিষ্কারের পরেও বিশেষজ্ঞরা তাকে ই-ইউ ভাষাপরিবারের অন্তর্গত দশম ভাষারূপে স্বীকার করতে একমত হতে পারেন নি। সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা হিট্টাইট ভাষার আলোচনাপ্রসঙ্গে করা যাবে। আপাততঃ বলে রাখি

অধিকাংশ পণ্ডিত পরবর্তীকালে তাকে ই-ইউ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন; তবে একথা মনে রাখতে হবে, সম্ভবতঃ এই ভাষাগুচ্ছটি অন্য ভাষাগুলির তুলনায় অনেক বেশীদিন আগে মূল ভাষা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিল। সেই কারণে এই ভাষায় অতি প্রাচীন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়ে থাকে। এবারে দশটি ভাষার নামগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) কেলটিক্ (২) ইটালিক (৩) গ্রীক (৪) জার্মান বা টিউটনিক (৫) তুখারীয় (৬) হিট্টাইট বা হিট্টীয় (৭) বাল্‌তো-শ্লাবিক (৮) আর্মেনীয় (৯) আল্‌বানীয় (১০) ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য।

মূল ই-ইউ ভাষাতে দু'টি প্রাথমিক উপভাষা-গত বিভাগ ছিল। মূল ভাষার কণ্ঠতালব্য (palatal-gutteral) ক্‌ (k) বর্ণের উচ্চারণ ভেদে তাই উপরিউক্ত দশটি ভাষাকে দুটি প্রধান উপভাষাগত বিভাগের অন্তর্গত বলে অনুমান করা হয়। পুরঃস্পৃষ্ট কণ্ঠ্য অর্থাৎ কণ্ঠতালব্য ধ্বনিগুলি গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মানিক, তুখারীয়, কেল্‌টিক ও হিট্টীয় ভাষায় পশ্চাৎকণ্ঠ্য ধ্বনিসমূহের সংগে একীভূত হ'য়ে গেছে। কিন্তু আর্য, আর্মেনীয়, আল্‌বানীয় এবং বাল্‌তোশ্লাভিক শাখাসমূহে ঐ ধ্বনিগুলি আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। তাই উপরে প্রদত্ত তালিকার প্রথম ৬টি ভাষা একটি গুচ্ছে এবং অপর ৪টি অন্য একটি গুচ্ছে বিভক্ত। মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ক্‌ (ধ্বনি) প্রথম ৬টি ভাষায় অবিকৃতভাবে উচ্চারিত, কিন্তু অপর চারটি ভাষাতে ঐ ধ্বনি শ্‌-ধ্বনিতে পরিণত হ'য়েছে।

উদাহরণরূপে নিচের শব্দগুলির বিবর্তন পর্যালোচনা করা যায় ঃ—

মূ. ই.ইউ. * dekm̥ (দের্ক্‌ম্‌) > গ্রী. দেকা
>জা. তেখু (>ত্‌সেহ্‌ন্‌=zehn, আধুনিক জার্মান)
>কেল্‌টিক· টেন্‌
>সং দশ } আর্য
>আবেস্তীয় দস }

মূ. ই. ইউ. * vim̐keti (বিংর্কেতি) >সং. বিংশতি

মূল ই. ইউ. ভাষার একশত বোধক 'km̥tom' শব্দটি বিভিন্ন ভাষাতে কিভাবে উচ্চারিত হ'য়েছে, তার নিরিখেই ই.ইউ. ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাসমূহের দুটি প্রাথমিক উপভাষাগত বিভাগ স্থির করা হ'য়েছে। একটি কেন্তম্‌ (আমাদের তালিকার প্রথম ছয়টি ভাষা যার শাখাসমূহ) এবং অপরটি শতম্‌ (শেষের চারটি ভাষা যার অন্তর্গত)। উদাহরণযোগে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে।

মূ. ই. ইউ km̥tom >ল্যা কেন্তম্‌ (centum)
>গ্রী· হেকতোন্‌ (hékaton)
>প্রাচীন আইরিশ্‌. কেট্‌ (cēt)
>গথিক. খুন্দ্‌ (ʎund)
>তুখারীয়· কন্দ্‌ (kand)
>ইং. হন্‌ড্রেড্‌ (hundred)
>জা· tausend (তাউজেণ্ড্‌)

>ফরাসী কেন্ত্ (cent/প্রকৃতপক্ষে ফরাসীরা এটিকে 'সাঁ' এই উচ্চারণ করেন; তবে ই, এ ভিন্ন স্বরের পূর্ববর্তী 'c'-এর উচ্চারণ 'ক্'-এর মত)

>ওয়েল্শ. কন্ত্ (kant)

কিন্তু একই* k̑m̥tom শব্দ হতে > সং. শতম্

> অবেস্তা. সতম্ (satəm)

> লিথুয়ানীয়. জ়িম্তাস্ (sz̆imtas)

> শ্লাবিক. সুতো (suto) (রুশ)

মূল ভাষার অপর পুরঃকণ্ঠ্য ধ্বনির বিবর্তনের উদাহরণঃ—

মূ. ই. ইউ. * g̑enos > সং. জনস্ (অর্থাৎ পুরঃকণ্ঠ্যবর্ণের তালব্যীভবন ঘটেছে)

> আ. জনো (jano)

কিন্তু > গ্রী. গোনোস্ (gonos)
> ল্যা. গেনুস্ (genus) } এখানে পুরঃকণ্ঠ্য কণ্ঠ্যবর্ণরূপেই বর্তমান

কেন্তম্ এবং শতম্ ভাষাগুচ্ছ সম্পর্কে আর একটি লক্ষ্যণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল এই যে শতম্ গুচ্ছে পশ্চাৎকণ্ঠ্য এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণসমূহের বিবর্তনে কোন প্রভেদ নেই অর্থাৎ শতম্ গুচ্ছে তারা একীভূত হ'য়ে গেছে। কারণ শতম্ গুচ্ছে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণগুলি তাদের ওষ্ঠ্য (labial) উপাদান হারিয়ে কেবলমাত্র কণ্ঠ্যবর্ণে পরিণত হ'য়েছে। উদাহরণ রূপে বলা যায় মূল. ই. ইউ. * $q^{w}o$ এবং qo

দুটি শব্দই সংস্কৃতে 'ক' (ka) এবং লিথুয়ানীয়তে কস্ (kas) রূপে আগত। কিন্তু * q^wo (কণ্ঠৌষ্ঠ্য-labiovelar) শব্দ গ্রীক এবং ল্যাটিনে যথাক্রমে পোথেন্ (poθen) এবং ক্বোদ্ (quod) শব্দে পরিণত; উভয়ত্রই তার ওষ্ঠ্য-উপাদান লক্ষ্যণীয়।

অন্যান্য সাধর্ম্যের ভিত্তিতে মূ. ই. ইউ. ভাষার আরও নানা উপভাষা-গত বিভাগের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যে বিভাগের আলোচনা করলাম তা স্বনির্ভর বলেই তাকে 'প্রাথমিক' বলেছি। কেন্তুম্ এবং শতম্ বিভাগ ই. ইউ. ভাষার অতি প্রাচীনতর স্তরেই শুরু হ'য়েছিল।

হিট্টী এবং তুখারীয় ভাষার আবিষ্কারের পূর্বে অর্থাৎ বিংশ শতকের শুরুতেও পণ্ডিতবৃন্দ এই ধ্বনি-বিচ্ছেদকে ভৌগোলিক সীমানা-ভিত্তিক মনে করেছিলেন। অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষাগুলি কেন্তুম গোষ্ঠীর এবং এশীয় ভাষাগুলি শতম্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু ১৯শ শতকের শেষে প্রাচ্য ভূখণ্ড এশিয়াতে কেন্তুম গুচ্ছের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তুখারীয় এবং হিট্টাইট ভাষার আবিষ্কারের পর তাঁরা মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হ'য়েছেন।

এইবার কেন্তুম্ ও শতম্ শাখার বিভিন্ন ভাষাগুলির পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

১। কেল্‌তিক (celtic): একদা সমগ্র পশ্চিম এবং দক্ষিণ ইউরোপে এই ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু কালক্রমে ইতালিক ও জার্মানিক ভাষার প্রসারের ফলে এই ভাষা লুপ্তপ্রায় হ'য়ে আসে। বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্স এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের

পার্বত্য অঞ্চলের কিছু লোকভাষার মধ্যে এই ভাষার পরিচয় মেলে। আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা অধিকাংশই অবশ্য এখনও এই ভাষায় কথা বলে।

কেল্‌তিক ভাষার প্রধান তিনটি বিভাগ—(১) গলিক (২) ব্রিটানীয় এবং (৩) আধুনিক গলিক। কেউ কেউ আবার এই ভাষাকে p-কেল্‌তিক এবং q-কেল্‌তিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। কেল্‌তিক ভাষাতে পাঁচটি কারক আছে।

গলিক ও তার অন্যান্য শাখার প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন চতুর্থ শতকের কিছু শিলালিপিতে পাওয়া যায়। কেল্‌তিকের শাখাসমূহের মধ্যে আইরিশ্‌ই সমৃদ্ধতম। এটি আধুনিক গলিক বা গ্যালিক বিভাগের শাখা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপিতে এবং অষ্টম শতকে লিখিত কিছু গ্রন্থে আইরিশ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়।

২। **ইতালীয় বা ইটালিক :** এই ভাষার নিদর্শন খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতকে যা পাওয়া যায় তা অতি সামান্য। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকেও মুদ্রা বা পাত্রে উৎকীর্ণ যা কিছু প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হ'য়েছে তার মূল্যও অতি অল্প। ব'লতে গেলে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই ইতালীয় ভাষার প্রকৃত, লিখিত এবং সাহিত্যিক পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ভাষা পূর্বে ইতালী, সিসিলি, কর্সিকা এবং অন্যান্য কিছু ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপে ব্যবহৃত হ'ত। প্রাচীন ইতালীয় ভাষার তিনটি উপভাষাগত বিভাগ ছিল—(১) ওস্কান্ (Oscan) (২) উম্‌ব্রিয়ান্ (Umbrian) এবং (৩) লাতিন (Latin)। খ্রীষ্টযুগের আরম্ভের পর

প্রথম দুটি উপভাষা বিলুপ্তির পথে অন্তর্হিত হয়। যেটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় গ্রীকের মত ওস্কান্ এবং উম্‌ব্রিয়ান্ ভাষাতেও মূল ই-ইউ. ভাষার কণ্ঠৌষ্ঠ্য ক-বর্গ প-বর্গে পরিণত হয়।

লাতিন ছিল লাতিউম প্রদেশের ভাষা; যার রাজধানী ছিল রোম। রোমের সমৃদ্ধির সাথে সাথে তথা রোমক সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তারের সংগে সংগে এই লাতিন ভাষা ইতালীর ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও আপন মর্যাদা বিস্তার করতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, গ্রীক সংস্কৃতির অবক্ষয়ের পরে লাতিনই হ'য়ে দাঁড়ায় সমগ্র ইউরোপের প্রধান সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক ভাষা। লাতিন ভাষায় রচিত ধ্রুপদী (classical) সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইউরোপের আধুনিক সাহিত্য সমূহের উপর লাতিন সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের আধুনিক ভাষার মধ্যে ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, সুইজারল্যাণ্ডীয় ভাষা এবং বল্কান্-অঞ্চলের কিছু ভাষারও উৎস এই লাতিন ভাষা।

লাতিন ভাষার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ—

(১) মূল ভাষার যৌগিক ধ্বনি এখানে একস্বরে পরিণত হয়েছে।

(২) সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ অঘোষে রূপান্তরিত। যথা সং. ভ্রাতা, লা. frāter, ফরাসী frère.

(৩) এই ভাষাতে ছয়টি কারকের অস্তিত্ব স্বীকৃত।

(৪) স্বর-সঞ্চারের (accent) গুরুত্ব খুব বেশী।

৩। গ্রীক: প্রাচীনকালে গ্রীক ভাষার প্রসার ছিল গ্রীস্, এশিয়া

মাইনরের উপকূল-অঞ্চল, সাইপ্রাস দ্বীপ এবং ঈজিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে। খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতক থেকে এই ভাষার লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাকবি হোমার বিরচিত ইলিয়দ্ ও ওদিসি এই মহাকাব্যদ্বয়ে প্রাচীন গ্রীকের সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে। গ্রন্থ দুটির রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতক। ইউরোপের সাহিত্য জগতে গ্রীক সাহিত্য অত্যন্ত মার্জিত এবং সমৃদ্ধ। সম্প্রতি ক্রীট্ দ্বীপে কিছু প্রত্নলেখের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার পাঠোদ্ধার যদি পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হয় তবে গ্রীকের প্রাচীনতম নিদর্শন-এর প্রাপ্তিকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ১৪৫০-এর নিকটবর্তী বলে স্বীকৃত হবে। খ্রীষ্ট জন্মের কাছাকাছি গ্রীক উপভাষাগুলির সংমিশ্রণে 'কোইনে' নামে এক সাধু ছাঁদের কথ্য ভাষা সৃষ্ট হয়। এই ভাষা হ'তেই আধুনিক গ্রীক ভাষার উৎপত্তি হয়।

সম্ভবতঃ এই নিরিখেই গ্রীক-ভাষার চারটি স্তর স্বীকৃত হ'য়ে থাকে। (১) প্রাচীন গ্রীক (২) চিরায়ত (classical) গ্রীক (৩) অন্তর্বর্তীকালীন (transitional) গ্রীক এবং (৪) আধুনিক (modern) গ্রীক।

গ্রীকের উপভাষাগত বিভাগ অতি প্রাচীনকালেই লক্ষিত হ'য়েছিল। তিনটি উপভাষা প্রধানতঃ স্বীকৃত হ'য়েছে। (১) দোরিক (Doric), (২) আত্তিক-ইওনিক (attic-ionic) এবং (৩) এওলিক (Aeolic)।

গ্রীকভাষাতে মূল ই-ইউ· ভাষার স্বরধ্বনিগুলি প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবে রক্ষিত হ'য়েছে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিও অধিকাংশ রক্ষিত হ'য়েছে তবে বহুস্থানে তাদের সঘোষত্ব বা মহাপ্রাণত্ব নষ্ট হ'য়েছে।

(তুলনীয়—সং. ভার, গ্রী. phéro—ফেরো ; সং. বোধামি, গ্রী. peuthomai—পেউথোমাই)। মূলভাষার কণ্ঠৌষ্ঠ্য ক-বর্গ প্রায়শঃ প-বর্গে পরিণত হ'য়েছে। (তুলনীয়—সং. কঃ, গ্রী. পোথেন্)। মূল-ভাষার লিঙ্গ এবং ধাতুরূপাদর্শও মোটামুটি সংরক্ষিত হ'য়েছে। প্রাচীন গ্রীকভাষাতে স্বর-এর (accent) গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত।

৪। জার্মানিক : ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের প্রাচীনত্ব এবং বিশিষ্ট নিদর্শনমালার জন্য গথিকের অবদান অসামান্য। গথিক্ জার্মানিক ভাষার অন্যতম প্রধান উপভাষা।

জার্মানিক ভাষাতে মূলভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়ই কিছু পরিবর্তিত হ'য়েছে। মূল ভাষার স্পৃষ্ট বর্গের তৃতীয় ব্যঞ্জন প্রথম, চতুর্থ ব্যঞ্জন তৃতীয় এবং প্রথম ব্যঞ্জন দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণে পরিণত হ'য়েছে। এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে। (তুলনীয় সং. গৌ, জা. kuh, ইং. কাউ ; সং √ধে, ইং. ডু ইত্যাদি। বিষয়টি গ্রিম এবং ভেরনার-সূত্রের মধ্যে পড়ে।) জার্মানিক ভাষায় অভিশ্রুতি (umlaut) এবং অপশ্রুতি (ablaut) অপর বৈশিষ্ট্য। লিঙ্গ এবং বচন অত্যন্ত স্থির এবং আভিধানিক। ধাতুরূপ অপেক্ষাকৃত সরলীকৃত। এই ভাষায় পাঁচটি কারক দেখা যায়।

জার্মানিক ভাষা তিনটি উপশাখায় বিভক্ত ছিল। (১) পূর্ব জার্মানিক, (২) পশ্চিম জার্মানিক, (৩) উত্তর জার্মানিক। পূর্ব জার্মানিক ভাষার নিদর্শন গথিক। খ্রীঃ ৪র্থ শতকে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক বুলফিলুস্ কর্তৃক এই ভাষায় বাইবেল্-অনুবাদ জার্মানিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এখন এই ভাষা অবলুপ্ত। ক্রিমীয়, বুর্গোঁডীয় এবং লোম্বার্ডীয় ভাষা সম্ভবতঃ গথিক-গুচ্ছেরই শাখা ছিল।

পশ্চিম জার্মানিক শাখাকে আবার দক্ষিণ জার্মান্ (High German), উত্তর জার্মান্ (Low German) এবং মধ্যদেশীয় (Middle German) এই তিন উপশাখায় ভাগ করা হয়। দক্ষিণ জার্মানিক্ শাখা কালক্রমে মধ্যদেশীয় ভাষাতে পরিণত হয় এবং তারপরে তার থেকে উৎপন্ন হয় আধুনিক জার্মান্ ভাষা। প্রাচীন জার্মানিক ভাষাকে মোটামুটি তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়। (১) প্রাচীন ফ্রুশীয় (২) মহাদেশীয় স্যাক্সন (continental Saxon) এবং (৩) এ্যাংলো স্যাক্সন্।

উত্তর জার্মানিক শাখাকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পশ্চিমা এবং (২) প্রাচ্য শাখা। আইস্ল্যাণ্ড এবং নরওয়ের ভাষা পশ্চিমা শাখার অন্তর্গত: ডেন্মার্ক এবং সুইডেনের ভাষা প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত।

৫। তুখারীয় বা তোখারীয়: অধুনালুপ্ত তুখারীয় ভাষার আবিষ্কার বর্তমান শতাব্দের প্রথমে। কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত মধ্য এশিয়ার চীনা তুর্কিস্তানের মরু-অঞ্চলে এই ভাষার কিছু লিখিত নিদর্শন এবং পুঁথিপত্র আবিষ্কার করেন। এই প্রত্নলেখ-গুলির অধিকাংশই ভারতীয় খরোষ্ঠী অথবা ব্রাহ্মী লিপির সদৃশ ভঙ্গীতে লেখা। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হ'তে দশম শতকের মধ্যে লেখা এই লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারের ফলে ই. ইউ. শাখার নবম ভাষার অস্তিত্ব স্বীকৃত হ'ল। কারণ বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রাপ্ত হ'লেও এই লিপিসমূহে ই. ইউ. ভাষার কয়েকটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হ'য়েছে। অধিকন্তু কেল্তিক এবং ইতালীয় শাখার সংগে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। এই ভাষায়

আঞ্চলিক মঙ্গোলীয় ভাষার প্রভাবও দেখা যায়। বর্তমানে এটি মৃত ভাষা ; সম্ভবতঃ খ্রীঃ ৭ম শতক হ'তেই এর অবলুপ্তি ঘটতে শুরু করেছে। 'তুষার' (তুখার) জাতির ভাষা ছিল এই অনুমানে এই ভাষার নামকরণ হ'য়েছে তুখারীয়। ভাষাটি হয়ত পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই আঞ্চলিক উপভাষায় বিভক্ত ছিল। পূর্বাঞ্চলীয় একটি লিপিতে 'তোখ্‌রী' এই নামটিও পাওয়া যায়। সুতরাং বিশেষজ্ঞরা এই ভাষাকে যথাক্রমে তুখারীয় ক (Tocharian A) এবং তুখারীয় খ (Tocharian B) এই দুটি উপভাষায় বিভক্ত ক'রেছেন।

৬। হিট্টীয় বা হিট্টাইট্ : তুখারীয়ের মত এই ভাষাও বর্তমান শতাব্দে আবিষ্কৃত। হুগো উইংক্‌লার (Hugo Winkler) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী বোগাজকোই-তে এই ভাষার কিছু লেখ্য নিদর্শন এবং প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেন। অধিকাংশ প্রত্নলিপিই বাণমুখ বা কীলকাক্ষরে (cuneiform letter) লিখিত। তার মধ্যে আবার কিছু নথিপত্র আক্কাদীয় হিট্টীয় ভাষায় লেখা এবং কিছু সুমেরীয় ও আক্কাদীয় হিট্টীয়ের মিশ্রিত ভাষায় লেখা। এই লেখ্যবস্তুগুলির মধ্যে কিছু অংশে অশ্ব-বিদ্যা বিষয়ে বিশদ বিবৃতি পাওয়া যায়। হিট্টীয় এবং মিট্টানি রাজদ্বয়ের পুত্রকন্যার বিবাহসংক্রান্ত চুক্তিপত্রটি এই ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই ভাষার কিছু শব্দ এবং দেবদেবীর নামের সংগে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (Old Indo-Aryan) সাদৃশ্য অত্যন্ত আশ্চর্য-ভাবে লক্ষিত হয়। যেমন, 'ঐকবর্তন', তুলনীয় সং. একবর্তন অর্থাৎ একচক্রবিশিষ্ট ; 'নাসত্তিয়ন', তু. সং. নাসত্যানাম্ ; 'ইন্দর', তু. সং. ইন্দ্র ; 'উরুবন', তু. সং. বরুণ ইত্যাদি।

আধুনিক বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে হিট্টীয় ভাষা মূল ই. ইউ. ভাষারই শাখাভুক্ত যদিও অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় এর প্রাচীনত্ব খুব বেশী। কিন্তু সেই অতি প্রাচীন কয়েকটি লক্ষণ বিচার ক'রে অপর পণ্ডিতগোষ্ঠী মনে করেন যে হিট্টীয় তথা তুখারীয় এবং হিট্টীয় একটি ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী গঠন করে। অন্যান্য প্রাচীনতার সংগে এই ভাষার কণ্ঠনালীয় বিশেষ হ্-(ḫ) ধ্বনি লক্ষ্যণীয়। সেই কারণে, E. Sturvent প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ এমনও বলেছেন যে এই হিট্টীয় ভাষা মূল ই. ইউ. ভাষারই সমসাময়িক অর্থাৎ তার ভগিনীস্থানীয় একটি ভাষা ছিল। তাঁদের মতে মূল ই-ইউ. এবং হিট্টীয় এই দুই ভাষার জননীস্থানীয় ইন্দো-হিট্টীয় (Indo-Hittite) নামে এক ভাষা ছিল। পরে ই-ইউ ভাষা তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং হিট্টীয় শাখাটি খ্রীষ্টযুগের গোড়ার দিকেই বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। অবশ্য অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এই ব্যাখ্যাকে স্বীকৃতি দেন নি। তাঁরা ই-ইউ ভাষার প্রাচীন (early) এবং অর্বাচীন (late) এই দুই স্তরকে স্বীকার ক'রতে আগ্রহী। এই মতানুসারে হিট্টীয় ভাষা মূল ই-ইউ ভাষার অতি প্রাচীন স্তরেই মূল ভাষা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিল। তাই তার মধ্যে যে প্রাচীন লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়, ই-ইউ ভাষার অর্বাচীন যুগের শাখাগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

কেন্তম্ গুচ্ছের ভাষাসমূহের পরিচয় নেওয়া হ'ল। এবারে শতম্ বিভাগের শাখাসমূহের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

৬। বাল্‌তোশ্লাবিক ঃ এই ভাষার তুটি উপশাখা—(১) বাল্‌তিক্ (২) শ্লাবিক (শ্লাভীয়) অথবা শ্লাভোনিক্।

বাল্‌টিক্ উপশাখার লিথুয়ানীয়, লাট্‌ভীয় (লেত্তিশ্) এবং প্রাচীন প্রুশীয় এই তিনটি বিভাগ। এ'দের মধ্যে লিথুয়ানীয় ভাষা প্রাচীনতম। এই ভাষাতে স্বরসঞ্চার এবং অন্যান্য প্রাচীন ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

শ্লাবিক শাখারও তিনটি বিভাগ—পূর্বদেশীয়, দক্ষিণদেশীয় এবং পশ্চিমদেশীয়। দক্ষিণদেশীয় উপশাখার অন্তর্ভুক্ত হ'ল বুল্‌গারীয় এবং সার্বীয় ভাষা। চেক্, শ্লোবাক্ এবং পোলিশ্ ভাষা পশ্চিমা উপশাখার অন্তর্গত। পূর্বদেশীয় ভাষা বলতে রুশভাষাসমূহকে বোঝায়। তাদের মধ্যে 'মুখ্য রুশভাষা' (Great Russian) প্রধান এবং আদর্শস্থানীয় (standard) ভাষা। এই ভাষায় খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী হ'তেই সাহিত্য রচিত হ'য়েছে। এ'ছাড়া রয়েছে শ্বেত রুশীয় (White Russian) এবং ইউক্রেনীয় ভাষা।

বাল্‌তোশ্লাবিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন প্রাচীন বুল্‌গারীয় বা ওল্‌ড্ চার্চ শ্লাবিক ভাষায় রচিত বাইবেল্-এর নিউ টেস্‌টামেন্ট্-এর অনুবাদ। এই অনুবাদ সম্ভবতঃ খ্রীঃ ৯ম শতকে সম্পন্ন হ'য়েছিল। ক্রিয়ার কাল, স্বর প্রভৃতি বিষয়ে বাল্‌তোশ্লাবিক ভাষা মূল ভাষার অনেক লক্ষণ অবিকৃতভাবে রক্ষা ক'রেছে।

৭। আর্মেনীয় ঃ ইরাক্, এশিয়া-মাইনর এবং পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আর্মেনীয় জাতির অধিবাসীদের মুখ্য ভাষা হ'ল আর্মেনীয় ভাষা। এই ভাষায় সম্ভবতঃ খ্রীঃ ৫ম শতকে বাইবেল অনূদিত হয়। তবে সামগ্রিকভাবে এই ভাষার যথার্থ নিদর্শন

মেলে খ্রীঃ ৮ম শতাব্দ হ'তে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার চেয়ে এই ভাষাতে মূল ভাষার ধ্বনিসমূহের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক বেশী। যতদূর মনে হয় এর কারণ পরিপার্শ্বের সেমিটিক এবং মঙ্গোলীয় প্রভাব। এই ভাষার সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য শব্দের আদিতে কণ্ঠনালীয় 'হ্' ধ্বনির সংরক্ষণ যা সম্ভবতঃ হিট্টীয় ভাষার প্রভাবের লক্ষণ। এক সময়ে যে সকল স্থানে হিট্টীয় ভাষা প্রচলিত ছিল সেই স্থানসমূহেই আর্মেনীয় ভাষা প্রসার লাভ ক'রেছিল।

৯। **আল্‌বানীয়ঃ** এইটি ই-ইউ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে গৌণতম ভাষা। খ্রীঃ ১৭ শতকের পূর্বে এই ভাষার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সেই নিদর্শনসমূহ কোন সমৃদ্ধ সাহিত্যের পরিচয়বাহী নয়। সামান্য কিছু শিলালিপি বা প্রত্নলেখ মাত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হ'য়েছে। অধিকন্তু এই ভাষা অন্যান্য ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিকৃত। রুমানীয়, শ্লাভীয়, তুর্কী প্রভৃতি বহু ভাষার প্রভাবে এর নিজস্ব স্বরূপ উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ। আড্রিয়াতিক সাগরের পূর্ব উপকূলের কিছু অধিবাসী এই ভাষা ব্যবহার করে। প্রথমে এই ভাষাটিকে বিশেষজ্ঞগণ ই-ইউ· ভাষার পৃথক শাখারূপে স্বীকার করেন নি। কিন্তু পরে এর নিজস্ব কতকগুলি ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের কারণে একটি পৃথক শাখারূপে এই ভাষা চিহ্নিত হ'য়েছে।

১০। **ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য ঃ** শুধু 'শতম্' গুচ্ছে নয়, সমগ্র ই-ইউ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই এই শাখার গুরুত্ব খুব বেশী। এশীয় ভূখণ্ডে এই গোষ্ঠীর আবিষ্কারের সংগে ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'য়েছিল, সেকথা আগেই আলোচিত হ'য়েছে।

মূল ই-ইউ-এর মত এই ভাষাও একটি অনুমিত ভাষা। পণ্ডিতসমাজ অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ১৪০০/১৫০০-র পূর্বে এই ভাষা-ভাষীগোষ্ঠী পূর্বদিকে যাত্রা ক'রে মূল ভাষা পরিবার হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। মূল ই-ইউ. ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের বাসস্থান কোথায় ছিল তার সঠিক নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত এই শাখার বিচ্ছিন্ন হ'ওয়ার সময়ের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক সুধীজন এই বিভাগ বা আর্য-গোষ্ঠীর পূর্বমুখী অভিযানের সময় সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত আজও গ্রহণ করতে পারেন নি। শুধু বলেছেন মূল ভাষা হ'তে এই বিভাগ এবং উপ-বিভাগ খ্রীঃ পূঃ ১৪ শতকের পরে নয়। তার পর এই শাখাভুক্ত মানুষেরা পারস্যের ভূখণ্ডে, পামীর মালভূমির আশেপাশে ছড়িয়ে থাকে। ক্রমশঃ একটি দল হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম ক'রে ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে। এই অনুপ্রবেশের প্রকৃতি কেমন ছিল সেবিষয়েও পণ্ডিত সমাজে নানা মত প্রচলিত। তবে কোন কোন প্রতীচ্যের বিষেশজ্ঞও স্বীকার করেছেন ভারতে আর্যদের প্রবেশকে বহুস্থানে অভিযান[1] ব'লে উল্লেখ করলেও তা হয়ত' ঠিক অভিযান (বা জবরদখল)-এর মত ব্যাপার ছিল না। হয়ত এই অনুপ্রবেশ ছিল নেহাৎই সাংস্কৃতিক এবং আদপেই কোন যুদ্ধাত্মক অভিযান নয়।[2]

---

[1] T. Burrow. The Sanskrit Language. প্রথম বাক্য।

[2] Gowen. Hist. of Indian Lit. "The precise period at which the Aryan invasion in India took place cannot be determined....It may not have been an invasion at all, in the usually understood sense,...Some have supposed the invasion was rather cultural than military." পৃঃ ৪৩।

সে যাই হোক এই ভাষা ছুটি উপশাখায় বিভক্ত হ'য়ে পড়ে—(১) ইরাণীয় (Iranian), (২) ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan)। গ্রীয়ারসন্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ 'দরদীয়' (Dardic) নামে কাশ্মীর, আফ্ গানিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান প্রভৃতি প্রদেশের ভাষার উৎস একটি তৃতীয় উপশাখার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

ইরাণীয় উপশাখার তিনটি বিভাগ স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। (১) উত্তরপশ্চিমদেশীয় বা আবেস্তিক। এই ভাষাতে ইরাণীদের প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্ আবেস্তা রচিত হয়। এর মূল (original) অংশসমূহ বহু পূর্বেই লুপ্ত হ'য়েছে। বর্তমানে এই ধর্মগ্রন্থের সামান্য অংশমাত্র আমাদের হাতে উপস্থিত। বৈদিক ভাষার সংগে গাথিক আবেস্তা অর্থাৎ আবেস্তার প্রাচীন অংশের ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ও সম্পর্ক র'য়েছে। শুধু ভাষা নয় ধর্ম ও দর্শনগত ঐকাত্মতাও লক্ষ্যণীয়। আচার্য জরথুশ্ত্র (জরথুষ্ট্র ?) এই ধর্মের প্রবক্তা। (২) দ্বিতীয় বিভাগ প্রাচীন পারসীক (Old Persian) দক্ষিণ-পশ্চিমদেশীয় ভাষা ছিল। (৩) তৃতীয় শাখা হ'ল আধুনিক ফার্সী (৮ম শতকে এর জন্ম) তথা শক, সোগদিয়ানা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার উৎস।

বস্তুতঃ প্রাচীন পারসীক ছিল জনসাধারণ তথা রাজসভার অনুশাসনের ভাষা এবং আবেস্তীয় ছিল ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় সমাজের ভাষা। প্রাচীন পারসীক ক্রমে বিবর্তিত হয় মধ্য পারসীকে (Middle Persian)। এই ভাষার প্রধান বিভাগ পহ্লবী ভাষা। এই ভাষায় আবেস্তার টীকা, বহু অনুশাসন ও ধর্মশাস্ত্রবিষয় গ্রন্থাদি, এবং অখ্মেনীয় রাজবংশের বর্ষপঞ্জী ও নির্দেশনামাসমূহ রচিত

হ'য়েছিল। এছাড়া অন্যান্য উপভাষার মধ্যে আছে শক, খোটানের কথ্য ভাষা সোগ্‌দিয়ানা এবং অন্য দুটি প্রাদেশিক ভাষা।

আবেস্তীয় ভাষারও তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তর অর্থাৎ গাথিক আবেস্তা (আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূঃ), মূল আবেস্তা (৬০০—৩০০ খ্রীঃ পূঃ) এবং সংকলিত আবেস্তা (সাসানীয় রাজশাসনের সময়)। এই তিনটি স্তর যথাক্রমে ভারতের বৈদিক-সংস্কৃত এবং প্রাকৃত স্তরের সংগে তুলনীয়।

আর্যশাখার দ্বিতীয় উপশাখা 'ভারতীয় আর্য' ভাষাও তিনটি স্তরে বিভক্ত। (১) প্রাচীন-ভারতীয়-আর্য (Old-Indo-Aryan), (২) মধ্য-ভারতীয়-আর্য (Middle Indo-Aryan) এবং নব্য-ভারতীয়-আর্য (New or Modern Indo-Aryan)। (১) প্রা-ভা-আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের বিতর্কের অবসান আজও হয়নি। তবে ভাষাতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আজও বলা হয় খ্রীঃ পূঃ ১২০০-১০০০-এর মধ্যে ঋগ্বেদ সংকলিত হয়েছিল। এই সময়কে কেউ বা ১৫০০, কেউ ২০০০, কেউ ২৫০০/৩০০০ ও বলেছেন।[1]* এছাড়াও সামবেদ-যজুর্বেদ-অথর্ববেদ-ব্রাহ্মণসমূহ-আরণ্যক এবং উপনিষৎসমূহ ও ব্যাপক সূত্রসাহিত্য ও বিভিন্ন পরিশিষ্ট গ্রন্থাদি পাওয়া গেছে।

---

[1] দেখ. Winternitz Hist. of Indian Lit. Vol. I Pt. I শেষাংশ

* ভারতবর্ষে আচার্য তিলক এবং জার্মান পণ্ডিত Jacobi কিন্তু পৃথকভাবে গবেষণা ক'রেও একই সংগে সিদ্ধান্ত করেন—ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ অব্দ।

তার পরে আসে ধ্রুপদী সংস্কৃতের বিচিত্র, বর্ণাঢ্য, সমৃদ্ধ সাহিত্য। বৈদিক ভারতীয় আর্যে স্বরের গুরুত্ব ছিল খুব বেশী, পরে তা ক্রমশঃ লোপ পায়।

(২) মধ্য ভারতীয় আর্যের মধ্যে পড়ে পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ইত্যাদি ভাষা। এই ভাষাতেও সাহিত্য রচিত হ'য়েছে। বহু শিলালিপি, রাজ-আইনসংক্রান্ত লেখ্য বিষয়সমূহে এই ভাষাগুচ্ছের নমুনা পাওয়া যায়। এই ভাষা ছিল জনসাধারণের মধ্যে অধিক প্রচলিত কথ্য ভাষা। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ অধিকাংশই পালিভাষায় রচিত।

(৩) নব্য ভারতীয় আর্যের মধ্যে পড়ে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা হ'তে একই ভাষা তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তিত হ'য়ে সরলতম রূপ পেয়েছে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে।

সাধারণভাবেই আর্য বা ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার দুটি শাখাতেই মূল ই-ইউ. স্বরধ্বনিগুলি অনেক পরিবর্তিত হ'য়েছে। কণ্ঠতালব্য র্ক ($\hat{k}$) শ-কার এবং স্-কারে পরিণত। এছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ মোটামুটি অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হ'য়েছে। ভারতীয় আর্যভাষায় কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণসমূহ হ'তে নূতন সৃষ্ট তালব্য বর্ণগুচ্ছের সৃষ্টি হ'য়েছে (চ, ছ, জ, ঝ) [তুলনীয় কোলিত্‌স্-সূত্র] অপশ্রুতি, এবং মহাপ্রাণতা নষ্ট হওয়া দুই শাখাতেই দেখা যায়। [তুলনীয় ই. ইউ. * √ ভেন্ধ্ > সং বন্ধ্—দেখ. গ্র্যাসমান্-সূত্র] প্রাচীনস্তরে লিঙ্গ-বচন ও পুরুষের সম্পর্কে আভিধানিক বিভাগ ছিল। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ যথেষ্ট জটিল ছিল।

সংক্ষেপে এই হ'ল আর্য শাখার মোটামুটী পরিচয়। এই সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ ইন্দো-ইরাণীয়-র বৈশিষ্ট্য এবং বৈদিক ও সংস্কৃতের তুলনা-প্রসঙ্গে করা যাবে।

Ref. T. Burrow. The Sanskrit Language.
B. K. Ghosh. Linguistic Introduction to Sanskrit.
Taraporewalla. Elements of the Science of Language.
Thumb. Das Handbuch des Sanskrit.
সুকুমার সেন. ভাষার ইতিবৃত্ত
পরেশচন্দ্র মজুমদার. সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার ক্রমবিকাশ

চতুর্থ অধ্যায়

ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার ধ্বনি ও রূপতত্ত্বগত বিচার

ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার সাধারণ পরিচয় এবং উপশাখাগত ও স্তরগত বিভাগ সম্পর্কে বিবরণ সমাপ্ত হ'য়েছে। এবারে পুনর্গঠিত এই 'আর্য' (Aryan)—ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা করা যাক। এই শাখার মানুষেরা মূল ভাষাগোষ্ঠী হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজেদের 'আর্য' নামে পরিচয় দিতেন। 'আর্য' শব্দের প্রাচীন অর্থ 'মহান্' বা 'গৌরবান্বিত'। সেই কারণে এই শাখার 'আর্য' এই নামকরণ হ'য়েছে। ইরাণ দেশে এই গোষ্ঠী অধিককাল বসবাস ক'রেছিল ব'লে একে ইন্দো-ইরাণীয় নামেও অভিহিত করা হয়।

এই ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সাজিয়ে এইভাবে পরিবেশন করা যায়ঃ—

(১) মূল ই. ইউ. * অ, এ, ও, ম্, ন্ (a, e, o, m̥, n̥) পরিণত হ'য়েছে 'অ' (a) ধ্বনিতে। যথা ই. ইউ. * দেক্́ম্ (dek̂m̥) > ই. ইরা. দস, সং. দশ।

(২) মূল ই. ইউ. * আ, দীর্ঘ 'এ', দীর্ঘ 'ও', দীর্ঘ 'ম্', দীর্ঘ 'ন্' (ā, ē, ō, m̥̄, n̥̄) পরিণত হ'য়েছে আ (ā) ধ্বনিতে।

[আশ্চর্যের সংগে লক্ষ্যণীয় আধুনিক ফার্সী ভাষাতে দীর্ঘ ও উদাত্ত অ-ধ্বনি আছে, কিন্তু 'আ' সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।]

(৩) মূল ই. ইউ. * অই, এই, ওই, অউ, এউ, ওউ (ai, ei, oi, au, eu, ou) আর্যশাখাতে 'এ' এবং 'ও' ধ্বনিতে পরিণত

হ'য়েছে। যেমন ই. ইউ. * ভেউধোমাই (bheudhomāi) > সং. বোধামি।

(৪) মূল ই. ইউ. * অতিহ্রস্ব স্বর 'ə' (schwa) আর্য শাখাতে ইকারে (i) পরিণত। ই-ইউ অন্যান্য শাখাতে তা অ-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হ'য়েছে। উদাহরণ : * pətēr > আবেস্তীয়/সংস্কৃত 'পিতর্' > পিতা > গ্রীক/ল্যাটিন 'পতের্'

(৫) এই ভাষায় তালব্যবর্ণের দুটি গুচ্ছ দৃষ্ট হয়। একটির উৎস মূল ভাষার কণ্ঠতালব্য বা পুরঃকণ্ঠ্য ক̂-বর্গ ; অপরটির উৎস পশ্চাৎকণ্ঠ্য এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য ক-বর্গ।

অর্থাৎ মূল ই-ইউ. * ক্̂, গ্̂, ঘ্̂ (k̂, ĝ, ĝh) > শ্, জ়্, ঝ়্ (ś, ž, žh) [জ়্-এর উচ্চারণ ইংরাজী 'reasonable' শব্দের 's'-এর মত। বর্গীয় জ থেকে পৃথকত্ব বোঝানোর জন্য নীচে বিন্দুটি প্রযুক্ত হ'য়েছে। এবং ঝ়্-এর উচ্চারণ 'measure', 'pleasure' ইত্যাদি শব্দের 's'-এর মত। এখানে নীচে বিন্দুটি পূর্বোক্ত প্রয়োজনে ব্যবহৃত। এই দুটি ধ্বনি ফরাসী, রুশ, আধুনিক ফার্সী, জার্মান প্রভৃতি ভাষাতেও বর্তমান।]

সংস্কৃতে অর্থাৎ ভারতীয় আর্যভাষাতে এই ধ্বনিগুলি যথাক্রমে শ্, জ্ এবং 'হ'-তে পরিণত হয়েছে। ইরাণীয় শাখায় তারা অবিকৃত রয়ে গেছে।

ইন্দো-ইরাণীয় শাখার দ্বিতীয় তালব্য-বর্গের সৃষ্টি হ'য়েছে পশ্চাৎকণ্ঠ্য এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য ক-বর্গ হ'তে। যখন এই বর্গদ্বয়ের অব্যবহিত পরে তালব্য স্বরধ্বনি অর্থাৎ ই, এ এবং অর্ধস্বর য্ (i̯ >y) থাকে তখন তারা পরিণত হ'য়েছে চ-বর্গে। সুতরাং

ই. ইউ. * ক্, গ্, ঘ্, ক্ব্, গ্ব্, ঘ্ব্ (q, g, gh, qʷ, gʷ, gʷh) ধ্বনি ইন্দো-ইরাণীয় শাখায় চ্, জ্ এবং (ঝ্) হ্ (c, j', j'h) ধ্বনিতে পরিণত। যেমন ই ইউ. ক্বিদ্ (qʷid) > আবে./সং. চিত্।

(৬) ই, উ, ঋ, ঌ, র্ক্, র্গ্, র্ঘ্ (i, u, ṛ, ḷ, k̑, g̑ g̑h)-এর অব্যবহিত পরবর্তী মূল ই ইউ. দন্ত্য স্ (S) তালব্য শ্-তে (Ś) পরিণত হ'য়েছে। ভারতীয় আর্যে তা পরিণত হ'য়েছে মূর্দ্ধন্য ষ্ (Ṣ)-তে।

(৭) মূল. ই. ইউ. ভাষাতে শব্দরূপের ৬ষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি ছিল ওঁম্ (ōm)। ই. ইরা-তে তা 'আম্'-এ পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু এই শাখার অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় আর্যশাখাতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের ক্ষেত্রে 'আম্' বিভক্তি (প্রাচাম্, বণিজাম্ ইত্যাদি) দেখা গেলেও স্বরান্ত শব্দের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই ৬ষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তিটি 'নাম্'। (নরাণাম্, নদীনাম্ ইত্যাদি।) প্রাচীন বৈদিক ভাষায় অবশ্য স্বরান্ত শব্দও ৬ষ্ঠী বহুবচনে আম্-বিভক্তি যুক্তরূপে দৃষ্ট হয়। তাই 'দেবানাং জন্ম'-র পরিবর্তে বেদে 'দেবাং জন্ম' এই প্রয়োগ দেখা যায়।

(৮) সংস্কৃতে লোট্-এর ১ম পুরুষ একবচন ও বহুবচনে যথাক্রমে 'তু' ও 'অন্তু' বিভক্তি লক্ষ্য করে অনুমান করা হয় 'অনুজ্ঞা' (imperative)-তে এই 'উ' বিভক্তি মূল ইন্দো-ইরাণীয় ভাষারই বৈশিষ্ট্য ছিল।

(৯) বর্তমান (লট্) উত্তমপুরুষ একবচনে মি-বিভক্তিটি একটি অতিরিক্ত প্রত্যয়যোগ। মূল ই. ইউ-তে বিভক্তিটি ছিল ওঁ (ō)। তা'ই-ইরা-তে 'আ'-তে রূপান্তরিত। তারপরে আবার মি-প্রত্যয় যোগ করা হ'য়েছে। [আধুনিক ফার্সী-ভাষাতেও বর্তমানকালে

ধাতুর পূর্বে উত্তমপুরুষ একবচনে 'মি'-যুক্ত হয়। মির্‌যভ্যম্=আমি যাই।] উদাহরণ— √ভূ>ভবা>ভবামি।

মূলভাষার অন্যান্য ধ্বনিসমূহ এবং রূপতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য এই ভাষা-য় মোটামুটি রক্ষিত হ'য়েছে। তবে এই আর্যশাখাও নানা ভাবে বিবর্তিত হ'য়েছে। সুতরাং এই ভাষার ইরাণীয় এবং ভারতীয় আর্য এই দুটি শাখার মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও পরিদৃষ্ট হয়। ইরাণীয় শাখায় বহু আর্য স্বরধ্বনি অপিনিহিত হ'য়ে গেছে। আবার ভারতীয় আর্যশাখায় আর্য মহাপ্রাণ ধ্বনি অনেক সময়ে অল্পপ্রাণ হ'য়ে গেছে। আবার ইরাণীয় শাখায় উষ্মীভবনের (spirantisation) প্রবণতা অধিক দেখা যায়। ইরাণীয় শাখায় ক্ (k̂)+স্ (s) শ্‌স্ (śs)-তে পরিণত, কিন্তু ভারতীয় আর্যে তা 'ক্ষ' (kṣ)-তে রূপান্তরিত হ'য়েছে।

এই ধরণের কিছু কিছু অবান্তর (internal) বৈষম্যের এবং বিবর্তনের ধারার প্রতি দৃষ্টি রেখেই সামগ্রিক ভাবে মূল ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্য-ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হ'ল।

Ref. S. Sen. History and Pre-history of Sanskrit.
Thumb. Das Handbuch des Sanskrit.
Taraporewalla. Elements of the Science of Language.
প. মজুমদার. সং. ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ
সু. সেন. ভাষার ইতিবৃত্ত
T. Burrow. The Sans. Language.
P. D. Gune. An Introduction to Comparative Philology.

পঞ্চম অধ্যায়

আবেস্তা ও বেদ

ইন্দো-ইউরোপীয় শতম্-গুচ্ছের ভাষাসমূহের প্রধান ভাষা ইন্দো-ইরাণীয় বিভিন্ন স্তরে বিবর্তিত হ'য়েছে। এর দুটি প্রধান বিভাগ ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্য—উভয়েই ক্রমান্বয়ে তিনটি স্তর (প্রাচীন-মধ্য-নব্য) অতিক্রম ক'রে তাদের বিবর্তনের ধারাকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে। এই দুটি বিভাগের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য ক'রেছেন; কিন্তু ডেন্মার্কের বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক রাস্ক (Rask) ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বিশ্লেষণাত্মক বিবৃতি পরিবেশন করেন।

ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্য এই দুই শাখার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন যথাক্রমে আবেস্তা ও বেদ। 'জরথুশ্‌ত্র'-ধর্ম-সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ আবেস্তা। আবেস্তার মূল অংশ ছিল কয়েকটি গাথা বা স্তবের সমষ্টি। এইজন্য তার ভাষাকে গাথিক আবেস্তীয় ভাষা বলা হয়। এই ভাষার সংগে বেদের ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত সাদৃশ্য একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট দেখা যাবে।

আবেস্তা ঃ তম্ অমবন্তং যজতম্
স্থূরং দামোহু সবিশ্‌তম্
মিথ্‌্রম্ যজাই জওথ্‌্রাবো ॥

তুলনীয় সংস্কৃতঃ তম্ অমবন্তং যজতং
স্বুরং ধামস্থ শবিষ্ঠম্।
মিত্রং যজৈ হোত্রাভ্যঃ॥[1]

এই দুটি উদাহরণে প্রথম চরণটি একেবারে অভিন্ন; অন্য দুটি চরণে সামান্য ধ্বনিগত বৈষম্য র'য়েছে। কিন্তু উচ্চারণের সময় ধ্বনিসাদৃশ্য যথেষ্ট অনুভূত হয়।

বিশিষ্ট গবেষক জ্যাকসন্ (Jacson) অত্যন্ত সমীচীনতার সংগে মন্তব্য ক'রেছিলেন—"Almost any Sanskrit word may be changed at once into its Avestan equivalents merely by applying certain phonetic laws". অর্থাৎ কয়েকটি ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে সম্ভবতঃ প্রতিটি সংস্কৃত শব্দেরই একটি আবেস্তীয় রূপ নির্ণয় করা সম্ভব। কয়েকটি শব্দের তুলনার মাধ্যমে এই বক্তব্যের তাৎপর্যকে স্পষ্টতর করা যায়।

সং.	হিরণ্য	আবে.	জ়রণ্য (zaranya)
সং.	অসুর	আবে.	অহুরা
সং.	যম	আবে.	জিম
সং.	মিত্র	আবে.	মিথ্র
সং.	মেধা	আবে.	মজ়দা (mazda)
সং.	পুত্র	আবে.	পুথ্র

অপর উদাহরণঃ—

হবনীম্ আ রাতুম্ আ
হওমা উপৈত্ জ়রথুশ্ত্রম্
[দ্রষ্টব্য Taraporewalla E. S. L.]

[1] সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত থেকে সংগৃহীত।

তুলনীয় সং. সবনীম্ (হবনীম্)
সং. ঋতুম্ (রাতুম্)
সং. সোম (হওম)
সং. জরদ্বুষ্ট্র (জরথুশ্ত্র)

[প্রাচীন পারসীক ধর্মাচার্য তথা ধর্মপ্রবক্তার জরথুশ্ত্র নামটি সম্ভবতঃ ভারতীয় বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতার 'কণাদ'-নামের মত কোন তির্য্যক নাম (nickname)। এই প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রপ্রণেতা গৌতমের 'অক্ষপাদ' নামটিও স্মরণীয়।]

ধ্বনিপরিবর্তন, শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং তালব্যবর্ণের উৎপত্তির বিষয়েও উভয় ভাষার সাদৃশ্য সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। আবেস্তীয় এবং বৈদিক উভয় ভাষাতেই ই. ইউ. অ, এ, ও ধ্বনি 'অ'-তে পরিণত। ই, ঈ, উ, ঊ অপরিবর্তিত। এবং আ, দীর্ঘ এ́, দীর্ঘ ও́ আকারে পরিণত হ'য়েছে উভয়ত্র।

যেমন ই. ইউ. * এস্তি (esti) > আবে. এবং সং অস্তি।
ই. ইউ. * এ́ধেত্ (ēdhēt) > আবে. আদাত্, সং আধাত্।

আগেই ব'লেছি ইন্দো-ইরাণীয় শাখার দুটি উপশাখাতেই ই. ইউ. অতি হ্রস্বস্বর (ə, schwa) ই-কারে পরিণত হয়েছে। *pətēr > আবে. এবং সং. পিতর্। অন্ত্য হ্রস্বস্বরসমূহ প্রায়শঃই আবেস্তীয় ভাষায় দীর্ঘ হ্রস্বধ্বনিতে পরিণত হয়। উদা. সং. 'হি', আবে. 'জ়ী' (zī) ; সং. 'অসুর', আবে. 'অহুরা'। ই. ইউ. সন্ধ্যক্ষর-গুলির 'ও'-ধ্বনিতে বিবর্তন আর্যশাখার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আলোচনা করেছি। (দেখ ইন্দো-ইরাণীয় বৈশিষ্ট্য ৩)। ইন্দো-

ইউরোপীয় কণ্ঠ্যবর্ণসমূহ হ'তে (gutturals) উভয় ভাষাতেই দুটি তালব্য-বর্গের সৃষ্টি হয়। (দেখ ই-ইরা. বৈশিষ্ট্য ৫)। আবেস্তীয় র্শ্, জ্, ঝ্, বৈদিক, শ্, জ্, হ্। জ় এবং ঝ়্-ধ্বনি বৈদিক ভাষায় তথা ভারতীয় আর্যের কোন শাখাতেই নেই। দ্বিতীয় তালব্য বর্গ চ্, জ্, ঝ্ উভয় ভাষাতেই সমান। শতম্ গুচ্ছের ভাষা ব'লে ই. ইউ. কণ্ঠতালব্য (palatal guttural) র্ক্-ধ্বনি ($\hat{k}$) উভয়ত্রই শিষ্‌ধ্বনিতে পরিণত (sibilant)। আবেস্তীয় 'দস', বৈদিক এবং সংস্কৃত 'দশ'; আবেস্তীয় 'সতম্', বৈদিক এবং সংস্কৃত 'শতম্' শব্দের বিশ্লেষণ পূর্বেই করা হ'য়েছে। ই. ইউ. দন্ত্য স্ (s)-এর আবেস্তীয় ভাষায় শ্-ধ্বনিতে এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ষ্-ধ্বনিতে পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (দেখ ই-ইরা. বৈশিষ্ট্য ৬)।

সংস্কৃতের অল্পপ্রাণ বর্ণগুলিকে আবেস্তীয় ভাষায় উষ্ম-ধ্বনিরূপে (spirants) দেখা যায়। যেমন সং. সখা, আবে. সহা। 'জ'-ধ্বনি উভয় ভাষাতেই অবিকৃত। সংস্কৃত এবং আবেস্তীয় উভয়ত্রই 'জীবন্তম্'-পদ পাওয়া যায়। মূল 'জরথুশ্‌ত্র' শব্দটিই একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ই. ইউ. অর্ধস্বর য্, ব্, ($\underset{\frown}{i}$, $\underset{\frown}{u}$) উভয়ত্রই 'য' এবং 'ব' ধ্বনিতে পরিণত। অর্ধব্যঞ্জন হ্রস্ব এবং দীর্ঘ 'ম্', 'ন্' ($\underset{\circ}{m}$, $\underset{\circ}{n}$, $\bar{\underset{\circ}{m}}$, $\bar{\underset{\circ}{n}}$), ধ্বনি যথাক্রমে 'অ' এবং 'আ' ধ্বনিতে পরিণত। আবেস্তায় যেখানে 'জ' পঠিত, বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষায় সেখানে অনেক সময় হ-এর ব্যবহার দেখা যায়। তুলনীয় আবে. 'জন্তারম্' সং. 'হন্তারম্'।

উভয়ের রূপতত্ত্বগত সাদৃশ্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আবেস্তীয় সর্বনামগুলি ভারতীয় আর্যভাষার সর্বনামসমূহের অনুরূপ। তুলনীয়

আবে. 'অজ়েম্', সং. 'অহম্'। শব্দরূপেও উভয়ে উভয়ের অনুপূরক। উভয় ভাষাতেই আটপ্রকার বিভক্তি, তিন লিঙ্গ এবং তিন বচন বিদ্যমান। কারকসমূহের ব্যবহারেও বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে না। ধাতুরূপেও বাচ্য, কাল, ভাব পরস্পর অনুরূপ। রূপ গঠনের সাদৃশ্যও আশ্চর্যভাবে লক্ষিত হয়। কর্মবাচ্যে লুঙ্ বিভক্তিতে 'ই'-বিভক্তি উভয়ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। তুলনীয় সং. 'অবাচি', আবে. 'অবাচী'। সং. শ্রবি, আবে. শ্রবী ইত্যাদি। [অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবনের প্রবণতার কথা আগেই উল্লিখিত হ'য়েছে।] অপশ্রুতি এবং অপিনিহিতি (ablaut and epenthesis) উভয় ভাষারই ক্রমবিবর্তনের মধ্যে যথেষ্টভাবে লক্ষিত হয়।

সংক্ষেপে এই হ'ল আবেস্তীয় এবং বৈদিক তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কিছু সাদৃশ্য এবং পরস্পরের ভাষাতত্ত্বগত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার বিশ্লেষণ। গভীরতর অনুসন্ধিৎসা বা ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তির জন্য প্রয়োজন উভয় ভাষায় রচিত সাহিত্যদ্বয়ের বিশিষ্ট এবং নিবিড় ও পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন। মূল আবেস্তা এবং বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের সামগ্রিক পঠনপাঠনজনিত জ্ঞান ব্যতিরেকে এই তুলনাত্মক আলোচনা কখনই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

Ref. **Taraporewalla** **Elements of the Science of Language.**
B. K. Ghosh **Linguistic Introduction to Sanskrit.**
Thumb **Handbuch des Sanskrit.**
Sen ভাষার ইতিবৃত্ত
P. D. Gune **An Introduction to Comparative Philology.**

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় আর্য-ভাষার বিভিন্ন স্তর

ভারতীয় আর্যেরা তাদের প্রাচীন বাসভূমি ছেড়ে পূবমুখী যাত্রা শেষ ক'রেছিল সম্ভবতঃ উত্তরপশ্চিম ভারতে এসে। অন্ততঃ মিটান্নি-নথিপত্রের আবিষ্কারের পর সুধীজন এই সিদ্ধান্তে মোটা-মুটি স্থিরভাবে উপনীত হ'য়েছেন। বলা হ'য়েছে আর্যেরা প্রথমে বসতি স্থাপন করে পাঞ্জাবের কাছাকাছি। ক্রমশঃ তারা পূর্বে ও দক্ষিণে অগ্রসর হ'য়েছিল। এই আধিপত্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ-সম্পর্কে বাস্তব কোন মীমাংসা আজও বিজ্ঞজনেরা ক'রে উঠতে পারেননি। তার সঠিক কাল-নির্ণয় বা সময়-সীমাও ঠিকমত নির্ধারণ করা যায়নি সেকথা আগেই বলা হ'য়েছে।

যাই হোক ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। ভারতীয় আর্য ভাষাও তার গতি অব্যাহত রেখে ক্রম-বিবর্তিত হ'তে লাগল। তার বিবর্তনের ধারাপথের তিনটি স্তরকে স্পষ্টতঃ চিহ্নিত করা যায়। তাদেরও আবার ছোটখাট উপস্তর নিশ্চয়ই আছে। সেই প্রধান তিনটি স্তর যথাক্রমে—(১) প্রাচীন, (২) মধ্য ও (৩) নব্য। প্রাচীন স্তরের মধ্যে পড়ে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য, ইতিহাস-পুরাণ ও ব্যাপক সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্য। পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ এবং তাদের সংগে যুক্ত কিছু গৌণ উপভাষাকে মধ্য স্তরের অন্তর্ভুক্ত ব'লে ধরা হয়। নব্যস্তরের মধ্যে আছে ভারতবর্ষের অধুনাতন প্রাদেশিক ভাষা এবং সাহিত্যসম্ভার। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার

সময়সীমা মোটামুটীভাবে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ (অথবা ১২০০) থেকে খৃঃ পূঃ ৫০০ (অথবা ৬০০) পর্যন্ত ব'লে অনুমিত হ'য়েছে। মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা তার পর থেকে খৃঃ ১০০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে। নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার বিকাশ তার পর থেকে আজও পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

এবারে তিনটি স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক।

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাঃ—হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত-ভেদে প্রতিটি স্বরবর্ণ, স্পর্শ-উষ্ম-অন্তঃস্থ ইত্যাদি সকল ব্যঞ্জনবর্ণ, তিন প্রকার শিষ্‌ধ্বনি (শ্, ষ্, স্), এবং অনুনাসিক মিলিয়ে পূর্ণ বর্ণমালা। একাধিক ব্যঞ্জনের যুক্ত ব্যবহার যথেচ্ছ পরিমাণে দেখা যায়। যেমন—ব্রহ্ম, প্রোজ্জ্বল, আশঙ্ক্যতে ইত্যাদি।

অপশ্রুতির (ablaut) ফলে শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং প্রত্যয়যুক্ত পদ গঠন করার সময়ে স্বরধ্বনি সমূহের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণ ঘটত। (√কৃ> কৃত, করণ, কারণ, কার্য, কর্তব্য ইত্যাদি। আবার √গ্রহ্ >গৃহীত, গ্রাহ্য, গ্রহনীয় ইত্যাদি)। স্বর-ব্যঞ্জন এবং বিসর্গ-সন্ধির বিচিত্র এবং জটিল প্রয়োগ বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈদিক ভাষায় স্বর-ধ্বনিগুলির উপর স্বর (accent)-এর বিশেষ তাৎপর্য ছিল।

(২) নামপদ, সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ—প্রত্যেকের শব্দ-রূপের বিপুল বৈচিত্র্য দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয়। ছয় কারক, সাতটি বিভক্তি, তিন লিঙ্গ এবং তিন বচনভেদে এক-একটি শব্দ হ'তে

অসংখ্য প্রত্যয়ান্বিত (inflected) রূপ পাওয়া যায়। অন্ত্য বর্ণ অনুসারে প্রত্যেক শব্দরূপের বিভিন্নতা সবিশেষ লক্ষ্যণীয়।

(৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধাতুরূপেও অজস্র বৈচিত্র্য র'য়েছে। আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ, কর্মবাচ্য-কর্তৃবাচ্য-ভাববাচ্য, ইচ্ছার্থক (সন্নন্ত), পৌনঃপুনিক (যঙন্ত) এবং বিশেষ্য-বিশেষণ-সৃষ্ট (নামধাতু), প্রেরণার্থক (ণিজন্ত) ইত্যাদি ভেদে ক্রিয়াপদ গঠনের যে ব্যাপকতা তা সত্যই বিস্ময়কর। এ ছাড়াও রূপ অনুসারে সাধারণভাবেই ধাতুগুলি দশটি গণে বিভক্ত। কাল এবং ভাব (Tense & Mood) অনুসারে আছে দশটি (বেদে এগারোটি) ল-কার। ধাতুরূপে তিন পুরুষ এবং তিন বচনের ব্যবহার সর্বদা পৃথক। ঘটমান ও অসমাপ্ত কৃৎ-প্রত্যয় এবং অসমাপিকার (participles, gerunds & infinitives) ব্যবহারও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

(৪) শব্দ এবং ধাতু উভয়ের সংগেই বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দসৃষ্টির আশ্চর্য প্রয়াস প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (গঙ্গা > গাঙ্গ, গাঙ্গেয়। সভা>সভ্য, সভেয়। মনু>মনায়ী, মনাবী)। তুলনাত্মক প্রত্যয়সমূহেরও (তর-তম-ঈয়স্-ইষ্ঠ) যথাযথ প্রয়োগ রয়েছে।

(৫) একাধিক পদ-গঠিত সমাসের ব্যবহার এই ভাষার ওজস্বিতা বাড়িয়েছে। তুলনীয় হিরণ্য-নির্ণিক্, অক্রবিহস্তৌ, দ্যাবাপৃথিবী (ঋগ্বেদ); প্রবরনৃপমুকুটমণিমরীচিচয়চর্চিতচরণযুগলঃ (পঞ্চতন্ত্র); দ্বাপান্তরাগতানেক-ভূমিপাল-মৌলিমালা-লালিত-চরণ-যুগলঃ, দীয়মানমণিশতসহস্রালঙ্করণকুতলেখ্যপত্রসঞ্চয়ম্ [কাদম্বরী];

ত্রিভুবনসর্গযাত্রাসংহারসংবদ্ধাভিঃ [দশকুমারচরিতম্] ইত্যাদি।

(৬) উপসর্গের স্বাধীন এবং যথেচ্ছ ব্যবহার এই ভাষার বৈচিত্র্যসাধনে এবং অর্থপূর্ণ ভাবপ্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। উপসর্গভেদে ধাতুর অর্থভেদ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তুলনীয়—√হৃ > প্রহার, আহার, বিহার, সংহার, পরিহার। √গম্—আগমন, প্রত্যাগমন, নির্গমন, সঙ্গতি, অবগতি ইত্যাদি।

(৭) এই স্তরে ছন্দ ছিল প্রধানতঃ অক্ষরমূলক। চিরায়ত (classical) সংস্কৃতে মাত্রাপরিমিত ছন্দের কিছু ব্যবহার দেখা যায়।

(৮) শব্দ বিভক্তি এবং ধাতু বিভক্তির (সুপ্ এবং তিঙ্) অর্থপূর্ণতার কারণে কোন নির্দিষ্ট পদক্রম বা বাক্যরীতির (syntax) প্রয়োজন ছিল না। ভাবপ্রকাশ এবং অর্থবোধের পক্ষে বিভক্তি এবং প্রত্যয়ের সঠিক প্রয়োগ এবং অনুধাবনই সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট ছিল।

২। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা :—মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে অশোকানুশাসনসমূহে যেগুলি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ হ'তে খৃঃ ৩০০ অব্দের মধ্যে লেখা হ'য়েছিল। পালি ভাষার ব্যাপক ব্যবহার হ'য়েছিল বৌদ্ধ সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থ-সমূহে। সংস্কৃত নাটকে, কিছু খণ্ডকাব্যে এবং জৈনদের কিছু গ্রন্থাংশে প্রাকৃত ব্যবহৃত। সংস্কৃত হ'তে পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশের বিবর্তনের নমুনা একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হ'তে পারে।

সং. দেব্যা, পা. দেবিয়া, প্রা. দেহীআ, অপ. দেহীয়।

আচার্য বররুচি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ 'প্রাকৃত' ব'লতে শৌর-

সেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী এবং পৈশাচী এই চার প্রকার ভাষাকে বুঝিয়েছেন। জৈন বৈয়াকরণ (খৃঃ ১২ শতক) অর্ধমাগধী, চূলিকা এবং অপভ্রংশ এই তিনটিকে তার সংগে যোগ ক'রেছেন। এ'ছাড়া অন্যত্র আরও অনেক প্রকার প্রাকৃতভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—আবন্তী, শাকারী, শাবরী, প্রাচ্যা ইত্যাদি। আচার্য বররুচি অপভ্রংশকে পৃথক প্রাকৃতরূপে স্বীকার করেন নি। কোন কোন আলঙ্কারিক আবার অপভ্রংশভাষাকে "দেশভাষিতম্" অর্থাৎ আঞ্চলিক কথ্যভাষারূপে নির্দেশ ক'রেছেন।

প্রায় সব প্রাকৃত বৈয়াকরণই সংস্কৃত ভাষাকেই প্রাকৃতের উৎসরূপে স্বীকার ক'রেছেন। উভয় ভাষার ধ্বনি-গত সাধর্ম্যও সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। উপরন্তু অধিকাংশ প্রাকৃতশব্দই সংস্কৃত-শব্দভাণ্ডারের ঈষৎ-বিকৃত বা বিবর্তিত রূপ। এই প্রসঙ্গে প্রাকৃত শব্দের নির্বচন সম্পর্কিত কয়েকটি অভিমতের পর্যালোচনা করা যায়। প্রাকৃত ব্যাকরণকৃৎ হেমচন্দ্র বলেছেন—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, তত্র ভবম্ তত আগতং বা প্রাকৃতম্।" মার্কণ্ডেয় ব'লেছেন—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্। তত্র ভবং প্রাকৃতমুচ্যতে।" অন্যত্র শোনা যায়—"প্রকৃতেঃ সংস্কৃতাত্ আগতং প্রাকৃতম্"; "প্রকৃতেঃ সংস্কৃতা-য়াস্তু বিকৃতিঃ প্রাকৃতির্মতা"; "প্রাকৃতস্য তু সর্বমেব সংস্কৃতং যোনী" ইত্যাদি।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তিনটি উপস্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম স্তরে পালি, দ্বিতীয় স্তরে প্রাকৃত এবং তৃতীয় বা অন্ত্য স্তরে অপভ্রংশ বা অবহট্ঠ। ডঃ গ্রীয়ার্সন এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা মধ্যস্তরের অর্থাৎ 'প্রাকৃত' উপস্তরের দুটি বিভাগ

বিশ্লেষণ করেছেন ; ক্রান্তিপর্ব এবং মধ্যপর্ব। যাই হোক সামগ্রিক-ভাবেও মধ্য-ভারতীয়-আর্যভাষা একটি ক্রান্তিস্তর। সুতরাং এই স্তরের ভাষাগত বিচার-বিশ্লেষণে পূর্বতন স্তরের নিরিখে তুলনা ক'রেই পরিবেশন ক'রতে হবে।

সেই বৈশিষ্ট্যসমূহকে সাজিয়ে ব'ললে এইরকম দাঁড়ায়—
(১) সংস্কৃত স্বরধ্বনিগুলির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সং. ঋৃ এবং ঌ ধ্বনি সম্পূর্ণ লুপ্ত। হ্রস্ব ঋ-কার কখনও 'অ', কখনও 'ই', কখনও 'উ'-ধ্বনিতে পরিণত। কখনও আবার তা স্বরধ্বনিযুক্ত র্-বর্ণে রূপান্তরিত হ'য়েছে। উদাহরণ—সং. মৃগ > পা. মগ, সং. হৃদয় > প্রা. হিঅঅ, সং. মৃণাল > প্রা. মুণাল, সং. ঋণ > পা. রিণ।

সন্ধ্যক্ষর ঐ এবং ঔ যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'-ধ্বনিতে পরিণত। সং. শৈল > পা. সেল। সং. কৌমুদী > প্রা. কোমুঈ।

হ্রস্ব স্বরধ্বনিসমূহ কখনও দীর্ঘতাপ্রাপ্ত, আবার দীর্ঘস্বর কখনও হ্রস্বস্বরে রূপান্তরিত। সং. অশ্ব > প্রা. আস, সং. কাব্য > প্রা. কব্ব, সং. সূত্র > পা. সুত্ত।

(২) ম্ বা ন্ ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন পদান্তে থাকলে তা লুপ্ত হ'য়েছে। সং. পশ্চাত্ > পা. পচ্ছা, প্রা. পচ্ছা, সং. তাবত্ > প্রা. দাব।

(৩) তিনটি শিষ্ ধ্বনি স্থানে একটি (সাধারণতঃ স্, মাগধীতে শ্) মাত্র রক্ষিত। সং. শকুন্তলা > প্রা. সউন্দলা, সং কেশ > পা./প্রা. কেস, সং. পশু > প্রা. পস্সু।

(৪) দন্ত্য ন্ প্রায়শঃ মূর্দ্ধণ্য ণ্-তে পরিণত। সং. নব > পা./প্রা. ণব। কনক > কণঅ।

(৫) যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি কখনও লুপ্ত, কখনও অপরটির সবর্ণে

অথবা সমদ্বিভবনে পর্য্যবসিত। সং. ক্রোধ >পা./প্রা. কোধ, সং ধর্ম্ম > পা./প্রা. ধম্ম, সং. পুত্র >পা./প্রা. পুত্ত, সং. অস্তি > প্রা. অত্থি, সং. চন্দ্র >চন্দ।

(৬) সংস্কৃত অঘোষধ্বনি সমূহ মধ্য-ভারতীয় আর্যে বহু সময়ে সঘোষতা এবং অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণতা লাভ ক'রেছে। সং. তাবত্ > প্রা. দাব, সং. শকুন্তলা > প্রা. সউন্দলা, সং. অপি > প্রা. বিঅ, সং. কুব্জ > পা. খুজ্জ।

(৭) সংস্কৃত 'য্'—মাগধী ছাড়া অন্যত্র 'জ্' ধ্বনিতে পরিণত। সং. আর্য্যপুত্র > প্রা. অজ্জউত্ত, সং. যদি > প্রা. জই।

(৮) শব্দরূপের সরলতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। দ্বিবচন লোপ পেল। পালিতে ৪র্থী এবং ৬ষ্ঠীর রূপ একাকার হ'য়ে গেছে। অন্যত্র ১মা ও ২য়া, ৩য়া ও ৫মীর মধ্যে রূপগত কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ব্যঞ্জনান্ত শব্দসমূহকে স্বরান্তে পরিবর্তিত ক'রে শব্দরূপ গঠনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল।

(৯) ধাতুরূপের বিপুল বৈচিত্র্যও ক্রমশঃ লোপ পেল। পালিতে আত্মনেপদের অস্তিত্ব থাকলেও তার ব্যবহার অত্যন্ত অল্প। প্রাকৃত স্তরে আত্মনেপদ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পালিতে সংস্কৃতের দশটি গণের পরিবর্তে সাতটি গণ অবশিষ্ট থাকল। প্রাকৃত স্তরে গিয়ে গণবিভাগের বিশেষ কোন পার্থক্য রইল না। সমস্ত ধাতুকেই একগণীয় ক'রে ফেলার অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষিত হ'ল। সং. সেবতে > প্রা. সেবতি। সং. প্রেক্ষতে > প্রা. পেক্খদি বা পেক্খই। সংস্কৃতের কাল এবং ভাববোধক দশটি বা এগারোটি ল-কারের মধ্যে মাত্র চারটি অবশিষ্ট থাকল। দ্বিবচনস্থলে বহুবচন প্রযুক্ত,

কারণ আগেই বলেছি এই স্তরে দ্বিবচন লোপ পেয়েছে। কৃদন্ত ও অসমাপিকার রূপগঠনের প্রভেদ এবং স্বল্পতাও যথেষ্ট লক্ষিত হয়।

(১০) সন্ধির প্রয়োগ কখনও সংস্কৃতানুগ, কখনও পরিবর্তিত।

(১১) বিভক্তি লোপের ফলে বাক্যে বিশিষ্ট পদসংস্থানের গুরুত্ব-বৃদ্ধি ঘটল।

(১২) ছন্দ প্রধানতঃ মাত্রামূলক। শেষের দিকে তা অন্ত্যানুপ্রাসে গিয়ে দাঁড়াল।

৩। **নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্য**—নব্য ভারতীয় আর্যতেও স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তিন শিষ্‌ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব! পদান্ত ব্যঞ্জন (ম্-ভিন্ন) এবং অ-বর্ণ প্রায়ই লোপ পেয়েছে। পদের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার কমে গেছে। পদমধ্যগত যুক্ত ব্যঞ্জনও স্বরভক্তি, স্বরাগম, সমীভবন প্রভৃতির মাধ্যমে সরলীকৃত হ'য়েছে। যুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপের ফলে অনেক সময় পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘতা সম্পন্ন হ'য়েছে (compensatory lengthening)। যেমন পত্র > পাতা। যুক্তব্যঞ্জনের সরলতার উদাহরণ—স্পর্শ > পরশ, কার্য্য > কাজ ইত্যাদি। শব্দরূপ এবং ধাতুরূপের সরলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। যুক্ত-ব্যঞ্জনের সরলীকরণের ফলে অনুনাসিকতা এসেছে। সং. বক্র > প্রা. বঙ্ক > বেঁকা। বহু প্রাচীন বিভক্তির পুনর্ব্যবহার এবং নতুন স্ত্রীলিঙ্গ সৃষ্টির ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল। কারক বিভক্তির স্থানে কিছু অনুসর্গের ব্যবহার বৃদ্ধি হ'য়েছে। ধাতুরূপের প্রাচীন রূপ গেল হারিয়ে। দ্বিবচনের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত। যৌগিক কালের ব্যবহার সৃষ্টি হ'য়েছে।

বিভক্তির অনিয়ম তথা লোপের ফলে বাক্যরীতির সুনির্দিষ্ট নিয়ম অত্যন্ত সাবধানে অবলম্বনীয়। ছন্দঃ পদ্ধতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে বেশীরভাগই মাত্রামূলক, কোথাও কোথাও অক্ষরমূলক (পয়ার, মাইকেলের চতুর্দশপদী সনেট ইত্যাদিতে)। আধুনিক ভারতীয় আর্যের শেষ বিশিষ্ট লক্ষণ প্রচুর বিদেশী শব্দের পরিগ্রহণ। অপভ্রংশ পর্যন্ত শব্দভাণ্ডার মোটামুটী সংস্কৃতাশ্রয়ী ছিল। কিন্তু নব্যস্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণবশতঃ বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় প্রাদেশিক শব্দরাজি এমনভাবে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে অনুপ্রবেশ করেছে যে তাদের স্বরূপ এবং উৎস বা ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় যথেষ্ট দুরূহ।

Ref. P. D. Gune — An Introduction to Comp. Philology.
S. Sen — ভাষার ইতিবৃত্ত
S. Chatterjee — Origin and development of Bengali Language.
C. K. Raja — Prākṛt—Prakāśa
প. মজুমদার — সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ
A. C. Woolner — Introduction to Prākṛt.

সপ্তম অধ্যায়

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিশদ পর্যালোচনা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ঘটেছে তিনটি বা চারটি স্তর অতিক্রম ক'রে। (১) বৈদিক (কেউ কেউ এই স্তরটিকে আবার প্রাচীন এবং অর্বাচীন এই দুই ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন) (২) ইতিহাস-পুরাণের (Epic Sanskrit) সংস্কৃত এবং (৩) ভারতীয় আর্যের চিরায়ত সাহিত্যের (classical literature) পাণিনি-পতঞ্জলি সম্মত শিষ্ট সংস্কৃত ভাষা। রামায়ণ-মহাভারত তথা পুরাণসমূহের ভাষা অনেকটাই পাণিনি-নির্দিষ্ট স্ববন্ধনযুক্ত শিষ্ট আর্য ভাষার সংগে সাধর্ম্য রক্ষা করলেও তার মধ্যে অনিয়মিত, এবং স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাগ্‌ব্যবহারের যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখা যায়। সে আলোচনা পরে হবে। আপাততঃ বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুই প্রান্তিক-স্তরের পরিচয় নেওয়া যাক।

বৈদিক সাহিত্য হ'তে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতরণ করলে শুধু যে ভাষা-ছন্দ-ব্যাকরণগত পার্থক্যই চোখে পড়ে তা' নয়; উভয়ের ভাবগত পার্থক্যও যথেষ্ট অনুভব করা যায়। বৈদিক সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্মীয় তত্ত্ব এবং দার্শনিক ভাবনা ও তার ব্যাখ্যাতে উৎসর্গীকৃত। কিন্তু সংস্কৃত চিরায়ত সাহিত্য রাজসভার দরবারী সাহিত্য, তার ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, সামাজিক পরিবেশ সবই গেল ব'দলে। ধর্মীয় চিন্তাধারার একই

সূত্র অনুসৃত হ'লেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করার মত। ইন্দ্র-বরুণ, মিত্র, অদিতি ইত্যাদি বৈদিক দেবতাদের প্রাধান্য পরবর্তীকালে ক্ষীণ হ'য়ে গেছে ; সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে ত্রিমূর্তিবাদ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের আরাধনার বৈচিত্র্য। কেউ কেউ এমনও বলেন বৈদিক প্রাণোচ্ছল এবং আশাবাদী দর্শন এ'যুগে এসে অনেক পরিমাণে নৈরাশ্য এবং হতাশার দ্বারা কবলিত। তবে একথা সত্য যে বেদের সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবপ্রকাশের পদ্ধতির পরিবর্তে চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যে কৃত্রিম বাগাড়ম্বর, শব্দচিত্র এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য তথা ছন্দ-অলঙ্কারের বাহুল্যপূর্ণ ঝংকার অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

বৈদিক এবং সংস্কৃত উভয়েই 'দেবভাষা' নামে প্রসিদ্ধ। উভয়ের ধ্বনিগত বৈসাদৃশ্য বিশেষ নেই। কিন্তু ব্যাকরণগত বিচারে উভয়ের মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য বর্তমান। শব্দরূপ এবং ধাতুরূপের বিচারে দেখা যায় বৈদিক ভাষায় কাল এবং ভাববোধক এগারোটি ল-কার ছিল। ধ্রুপদী সংস্কৃতে অভিপ্রায় বা লেট্-এর প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। লঙ্ (imperfect), লুঙ্ (aorist) এবং লিট্ (perfect)—এই তিনপ্রকার অতীতকালের ব্যবহার থাকলেও তাদের বিভিন্নতার কোন বিশিষ্ট তাৎপর্য সংস্কৃতভাষায় রক্ষিত হয়নি। বেদে লুঙ্-পর্য্যায়ের ধাতুরূপেও অনুজ্ঞা (imperative), সম্ভাবক (optative) এবং অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ (subjunctive and injunctive) ভাবসমূহ ছিল। সংস্কৃতে এই ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। ধাতুর গণবিভাগগত বিশিষ্টতার নিয়ম বেদে বহু সময়ে লঙ্ঘিত হ'য়েছে, কিন্তু পাণিনি-নির্দিষ্ট ভাষায় তা সম্ভব ছিল

না। তাই পাণিনি নিজেই ব্যাকরণগত বিধান নির্দেশ করে আবার বলেছেন "ছন্দসি ব্যত্যয়ো বহুলম্"। ধাতুরূপ গঠনে বেদের বৈচিত্র্য অন্যভাবেও ছিল। যেমন সংস্কৃতের লট্-উত্তম-পুরুষ-বহুবচনে মস্-বিভক্তির পাশাপাশি বেদে মসি-বিভক্তির প্রয়োগও ছিল। ["ইদন্তো মসি"] ফলে 'এমঃ' স্থলে 'এমসি' ["নমো ভরন্ত এমসি"—ঋ. ১।১।৭], 'স্মঃ' স্থলে 'স্মসি' ["ত্বম্ অস্মাকম্ তব স্মসি"] ইত্যাদি ব্যবহার প্রায়ই চোখে পড়ে। তাছাড়া আছে এক 'শৃণু'-পদের স্থানে শৃণু, শৃণুহি, শৃণুধি, শ্রুধী ইত্যাদি নানা রূপের প্রয়োগ। বৈদিক বহু উভয়পদী ধাতুর কেবলমাত্র আত্মনেপদী রূপটিই সংস্কৃতে গৃহীত হ'য়েছে।

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। তা ধাতুর পূর্বে, পরে, এবং ধাতুর থেকে বিচ্ছিন্ন, ব্যবহিত ভাবেও প্রযুক্ত হ'তে পারত। সংস্কৃতে উপসর্গ কেবলমাত্র ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হ'তে পারে। ফলে বেদে "উপ ত্বাগ্নে...নমো ভরন্ত এমসি" [ক্রিয়াপদ—উপৈমসি], "মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি" [আগহি নয়], "বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রম্", এবং "হরিভির্যাহি ওক্ আ" [ক্রিয়াপদ আযাহি]—সর্বপ্রকার প্রয়োগই দেখা যায়।

সংস্কৃতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাববোধক তুমুন্-প্রত্যয়টির ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। কিন্তু বেদে তার সংগে আরও প্রায় সতেরোটি প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। [পাণিনির সূত্র তুলনীয় —"তুমর্থে সে-সেন্-অসে-অসেন্ ..তবেনঃ", "ঈশ্বরে তোসুন্-কসুনৌ" ইত্যাদি]। ফলে সং. 'জীবিতুম্'-এর বৈদিক বৈকল্পিক

'জীবসে'-পদ ছিল। এই রকম সং. 'হন্তুম্' বেদে 'হন্তুম্' এবং 'হন্তবৈ' ("ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ"—দেবীসূক্ত] ; অথবা "মধ্যা কর্তোঃ বিততং সংজভার" (সংস্কৃতে কেবল "কর্ত্তুম্" পদই সিদ্ধ) ইত্যাদি। অন্যান্য কৃদন্ত (participles & gerunds) প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বেদের ভাষার বৈচিত্র্য সংস্কৃতে হ্রাস পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সংস্কৃতের 'হিত্বা' পদের বৈদিক বৈকল্পিক রূপ ছিল 'হিত্বায়' (তুলনীয় "হিত্বায় অবদ্যং পুনরস্তম্ এহি"—অক্ষসূক্ত, ঋ. ১০।৩৪)। এছাড়া কৃত্বী, ভূত্বী ইত্যাদি প্রয়োগ ছিল। সংস্কৃতে কেবল কৃত্বা, ভূত্বা এই রূপগুলিই সংরক্ষিত হ'য়েছে।

শব্দের রূপরচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের তুলনায় বেদের ভাষার বৈচিত্র্য অনেক বেশী। একই বিভক্তি এবং বচনে বেদের একাধিক পদের মধ্যে সংস্কৃতে একটিকেই 'শুদ্ধ' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হ'য়েছে। অকারান্ত শব্দের প্রথমা বহুবচনে, যেমন দেব-শব্দের ১মা বহুবচনে 'দেবাঃ' এবং 'দেবাসঃ' (পাণিনিসূত্র "আজ্জসেরসুক্") দুটি রূপ ছিল। সংস্কৃতে দেবাঃ-পদটিই সিদ্ধ। এইভাবে প্রথমা-দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে, তৃতীয়া বহুবচনে বহু বৈকল্পিক পদ সিদ্ধ হ'ত। তুলনীয় সং. 'দেবৈঃ', কিন্তু বেদে তার পাশাপাশি 'দেবেভিঃ' (অবশ্যই মুনিভিঃ, সাধুভিঃ—ইত্যাদির সাদৃশ্যে) পদও ছিল। "দেবো দেবেভিরাগমত্"। ১মা-২য়া-তে নরৌ-এর পাশাপাশি 'নরা' পদ সিদ্ধ ছিল। এইরকম অন্যত্রও। অনেক সময় বিভক্তি যুক্ত না ক'রে তার লোপ অথবা পূর্ববর্ণের দীর্ঘতা অথবা অন্য কোন প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হোত। উদাহরণ স্বরূপ "যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্" [প্রকৃত পক্ষে 'ব্যোম্নি' এই ৭মী যুক্ত পদ শুদ্ধ],

"যঃ শশমানম্ উতী" [উত্যা পদ· সংস্কৃতে শুদ্ধ]। বৈদিক বহু ব্যঞ্জনান্ত শব্দ সংস্কৃতে স্বরান্ত রূপে পরিবর্তিত। যেমন বৈ. নক্ত্ > সং. নক্ত, বৈ. বিশ্ > সং. বিশ ইত্যাদি। কিছু শব্দ আবার সংস্কৃতে হ্রস্বস্বরান্ত, কিন্তু বেদে প্রায়শঃ দীর্ঘস্বরান্তরূপে দৃষ্ট। বিশিষ্ট উদাহরণ 'রাত্রি' শব্দ। বেদে তা অধিকাংশ সময়ে দীর্ঘস্বরান্ত। যেমন "ঔচ্ছত্ সা রাত্রী", "আত্রাত্রী সিমস্মৈ বাসস্তনুতে" ইত্যাদি। সর্বনাম শব্দের রূপগঠনের বিপুল বৈচিত্র্যও সংস্কৃতে যথেষ্ট সংকুচিত হ'য়েছে। ধ্রুপদী সাহিত্যের সংস্কৃতে কোথাও বেদের যুষ্মে, অস্মে, কস্মে অথবা ত্বা, ত্বীনম্, ত্বায়ম্ ইত্যাদি প্রয়োগগুলি দেখা যায় না।

সংস্কৃতের মত বেদের ভাষায় সন্ধির বন্ধনের নিয়মাবলী অত সুনির্দিষ্ট ছিল না। বেদে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে একই পদে তুটি স্বরবর্ণ পাশাপাশি অবস্থান করে; যেমন তিতউ, প্রউগ, সুউতয়ঃ ইত্যাদি; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় তা একেবারেই অসম্ভব। "সংহিতৈকপদে নিত্যা"—এ নিয়ম সর্বত্র অবশ্যই পালনীয়। আবার অনেক সময় কোন ব্যঞ্জনবর্ণ, বিশেষতঃ অর্ধস্বরকে সম্প্রসারিত করে সন্ধিবিযুক্তরূপে প'ড়তে হ'ত। যেমন 'ব্যোমন্' লেখা থাকলেও পড়তে হবে 'বিওমন্' এইভাবে। "সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে" এখানে ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে "সুঅস্তয়ে" এইভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

বেদের ভাষায় সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা অল্প। তিনটির বেশী পদের একপদীভাব খুবই কম। কিন্তু সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্যের কৃত্রিম বাগ্‌বিস্তারের আড়ম্বরে সমস্তপদের দীর্ঘতার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই প্রসঙ্গে দণ্ডী বিরচিত 'দশকুমারচরিতম্', বাণভট্টের 'কাদম্বরী' অথবা শ্রীহর্ষের রচনার নিদর্শন স্মরণীয়।

বেদের সমাসবদ্ধ পদ অনেক সময়ে পদান্তরের দ্বারা ব্যবহিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। উদাহরণ—"দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে।"

বৈদিক ছন্দের সংখ্যা ছিল মূলতঃ সাতটি—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী। কিছু মিশ্রিত ছন্দ যেমন 'পিপীলিকামধ্য' ইত্যাদিও ছিল তবে কাঠামো মোটামুটীভাবে ঐ সাতটিকে নিয়েই সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে সম-অর্ধসম-বিষম তিন প্রকার ছন্দেরই বিপুল বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। উভয়ের ছন্দঃপ্রয়োগের সাধর্ম্য একটি বিষয়ে রক্ষিত হ'য়েছে—উভয় স্তরেই ছন্দ প্রধানতঃ অক্ষরমূলক। তবে সংস্কৃতে মাত্রামূলক 'জাতি'ছন্দের ব্যবহারও দেখা যায় (উদাহরণ "গীত-গোবিন্দম্" গ্রন্থ)।

বৈদিক এবং সংস্কৃতভাষার ধ্বনি-সাধর্ম্যের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। দুই ভাষাতেই বর্ণসমূহ সমান; কিন্তু বেদে একটি নতুন ধ্বনির পরিচয় পাই—ল়্ (ळ्) এবং ল়্হ (ळ्ह)। উদাহরণ অগ্নিমীলে় পুরোহিতম্। চিরায়ত সংস্কৃতে এই ধ্বনি সম্পূর্ণ লুপ্ত। কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণের বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন পাণিনিসম্মত ভাষায় বলা হ'য়েছে ক-বর্গের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ (অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ), কিন্তু কোন প্রাতিশাখ্যে বলা হ'য়েছে "কবর্গস্তু জিহ্বামূলীয়ঃ"। সুতরাং হয়ত বেদে ক-বর্গকে জিহ্বা-মূলীয়রূপেই উচ্চারণ করা হ'ত।[1]

বৈদিক ভাষা ছিল স্বরপ্রধান, তথা সুরপ্রধান। স্বরসমূহের যথাযথ উচ্চারণের ব্যাকরণগত এবং শব্দার্থগত গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত

---

[1] palatal gutteral, এবং velar-এর পার্থক্য কি এই থেকেই সূচিত ?

বেশী। ধ্রুপদী সংস্কৃতে স্বরের গুরুত্ব নেই। বৈদিক ভাষায় স্বরের গুরুত্ব কত বেশী ছিল তার চরম উদাহরণরূপে "ইন্দ্রশত্রু" শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়। শব্দটি আত্মদাত্ত হ'লে বুঝতে হবে এখানে বহুব্রীহি সমাস হ'য়েছে এবং তার অর্থ হবে 'ইন্দ্র যার শত্রু'; কিন্তু যদি তা অন্তোদাত্তরূপে পঠিত হয় তবে বুঝতে হবে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হ'য়েছে এবং শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে 'ইন্দ্রের শত্রু'। এই উচ্চারণের তথা স্বরসঞ্চারের ভুলের ফলে ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষী এক দৈত্য যজ্ঞ করলেও, যজ্ঞাগ্নি থেকে যে অসুর উদ্ভুত হ'ল ইন্দ্র তার শত্রু হ'লেও যজ্ঞকারী দৈত্যকে সে নিহত করেছিল। তাই বলা হ'য়েছে—

"মন্ত্রো দুষ্টঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাত্‌॥"

বেদের তুলনায় পরবর্তী সংস্কৃতে মূর্দ্ধন্য বর্ণের সংখ্যা অধিক। তার কারণ সম্ভবতঃ ভারতীয় আর্য্য ভাষার উপরে অনার্য দ্রাবিড় এবং অষ্ট্রিক ভাষার প্রভাব। সংস্কৃতে ঐ দুই ভাষার বহু শব্দও গৃহীত হ'য়েছে। আবার বেদের কয়েকটি বিচিত্র শব্দের প্রয়োগ, যেমন মাকী, কেবট, সুম্ম প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার, লৌকিক সংস্কৃতে একেবারেই নেই। বৈদিক শব্দ সমূহের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটেছে লৌকিক সংস্কৃতে। যেমন বেদে 'বহ্নি' শব্দের অর্থ 'বহনকারী', লৌকিক সংস্কৃতে তার অর্থ শুধুই অগ্নি, 'কবি' শব্দের অর্থ ছিল 'ক্রান্তদর্শী', পরে তা শুধুই কাব্যরচনাকারীর অর্থ বোঝায়। বেদে

'অসুর' শব্দের অর্থ দেবতা, লৌকিক সংস্কৃতে তার অর্থ দেব বিরোধী। বৈদিক ভাষায় তার নিরুক্তি ছিল সম্ভবতঃ অসু-র (অসু=প্রাণ, অতএব প্রাণোচ্ছল, তুলনীয় "মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্") এবং পরে তা হ'য়ে গেল অ-সুর (ন > অ=বিরোধ)।

এই ভাবে দেখা গেল বৈদিক এবং লৌকিক উভয় ভাষাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারূপে পরিচিত হ'লেও উভয়ের মধ্যে একই ভাষার ক্রম-বিবর্তনগত পার্থক্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। শব্দ-ধ্বনি এবং রূপগত পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনাই তা প্রমাণ করে।

এবারে আসা যাক উভয়ের মধ্যবর্তী ইতিহাস-পুরাণের এবং আদিকাব্য রামায়ণের ভাষা-বিচারে। অর্থাৎ এককথায় **Epic Sanskrit**-এর বিশ্লেষণে। একে 'মহাকাব্যের সংস্কৃত' বলছি না; কারণ এই পারিভাষিক সংজ্ঞার অর্থাৎ 'মহাকাব্যে'র যে বিশিষ্ট লক্ষণ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দিয়েছেন তার উদাহরণ সংস্কৃত চিরায়ত সাহিত্যের "রঘুবংশ", "কুমারসম্ভব" ইত্যাদি গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত নয়। রামায়ণকে আমাদের ভাষায় বলা হ'য়েছে 'আদি-কাব্য' এবং মহাভারতকে বলা হ'য়েছে 'ইতিহাস' বা 'পঞ্চম-বেদ'। **Epic**-এর বাংলা ক'রে এদেরকে 'মহাকাব্য' নামে চিহ্নিত ক'রলে সংশয়ের অন্ত থাকবে না।

এই সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে পাণিনীয় সংস্কৃতের বিশেষ পার্থক্য নজরে পড়ে না। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচার করলে পাণিনিবিরুদ্ধ অনেক প্রয়োগও এই সাহিত্যে দেখা যায়। বৈদিক ধর্মাদর্শকে লোকাতত করার প্রয়োজনে এই গণসাহিত্য রচিত হ'য়েছিল। তাই সাধারণ্যে

প্রচলিত কথ্য-সংস্কৃতের বহু শিথিলতা তাকে স্পর্শ ক'রেছে। এমন কি বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতের সংগেও এর যোগ রয়েছে। ইতিহাস পুরাণের ভাষার সংগে প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃতের বিশেষ সাধর্ম্য নেই। পাণিনীয় ব্যাকরণ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা মোটামুটী অবহিত। সুতরাং তার মানদণ্ডে মহাকাব্যের পৃথক্ বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা করা যাক।

রামায়ণ-মহাভারতে পূর্ণ কাব্যরচনার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গদ্য বাক্য দেখা যায়। যেমন 'সঞ্জয় উবাচ', 'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ' ইত্যাদি। রামায়ণ এবং মহাভারত উভয়ত্রই লিঙ্গ এবং বচনের বিপর্যয় প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ফলে 'পুত্রদারেণ' 'চন্দ্রাদিত্যৈাঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়। আবার রামায়ণে অনেক স্থানে প্রহরণ, কূল, অস্ত্র, শস্ত্র ইত্যাদি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গে এবং আশ্রম, সন্তাপ, পশু ইত্যাদি পুংলিঙ্গ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত। ফলে "বিবিধান্ অস্ত্রান্ ধনধান্যপশূনি চ" এই প্রয়োগ সেখানে মেলে।

শব্দরূপের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথমেই ব'লতে হয় বহু ব্যঞ্জনান্ত শব্দকে রামায়ণ-মহাভারতে স্বরান্তরূপে দেখা যায়। সুতরাং 'পক্ষিম্', 'মহিমাম্', 'তপস্বীনাম্' ইত্যাদি প্রয়োগ সেখানে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট। সমাসান্ত নিয়ম বিধির লঙ্ঘনের ফলে 'পতিনা' 'ধর্মরাজানম্' ইত্যাদি পদ পাওয়া যায়। এই প্রয়োগ সম্ভবতঃ সাদৃশ্য ঘটিত (analogical)। শব্দরূপ রচনার ক্ষেত্রে বিভক্তি বিপর্যয়ও প্রায়ই ঘটেছে। বিশেষতঃ প্রথমা ও দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী ও ষষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা' অধিক লক্ষিত। সর্বনামের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠীর একবচনে

৪র্থীর 'তুভ্যম্' ও 'মহ্যম্' পদের ব্যবহার এবং তৃতীয়াতে ৪র্থী এবং ৬ষ্ঠীর 'মে' ও 'তে' পদের ব্যবহার দেখা যায়।

ধাতুরূপের ক্ষেত্রে অ-বিকরণজাত প্রয়োগাদর্শের প্রতি অধিক প্রবণতা লক্ষিত হয়। ফলে উপাসন্তে, হিংসামি, সমাশ্বস ইত্যাদি অপাণিনীয় ধাতুরূপের সন্ধান সেখানে বিরল নয়। এছাড়া ব্যতিক্রমস্থানীয় প্রয়োগ হ'ল 'ব্রবীমি'-স্থলে 'ব্রূমি', 'জহি'-স্থলে 'জহীহি' ইত্যাদি।

কর্মবাচ্য এবং কর্তৃবাচ্য তথা আত্মনেপদ এবং পরস্মৈপদের বিপর্যয়ও প্রায়ই দেখা যায়। ফলে √শ্রু কর্মবাচ্যে 'শ্রূয়ন্তি' এই রূপ পেয়েছে। রামায়ণে এবং মহাভারতে লঙ্, লিট্ ও লুঙের ব্যবহারগত পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। মহাভারতের তুলনায় অবশ্য রামায়ণে লিট্-এর প্রয়োগ বেশী। নিষেধার্থক 'মা' যোগে আগমযুক্ত পদের প্রয়োগ রামায়ণ-মহাভারতে খুব বেশী দেখা যায়। উদাহরণরূপে "মা ত্বাম্ কালোঽত্যগাত্" "মা মন্যুবশম্ অন্বগাঃ", "মা বালিপথম্ অন্বগাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগের উল্লেখ করা যায়।

অসমাপিকা কৃদন্ত পদগঠনের বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারতে সেট্ ও অনিট্ এবং উপসর্গ যুক্ততা ও উপসর্গ বিহীনতা এই ভেদ-গুলি প্রায়ই লঙ্ঘিত হ'য়েছে। ফলে 'আনেতুম্'-এর পরিবর্তে সেখানে 'আনয়িতুম্' এবং 'চরিতুম্'-স্থানে 'চর্তুম্' এই পদ দেখা যায়। অন্যান্য তুলনীয় উদাহরণ 'কর্ষিতুম্', 'বেত্তুম্' ইত্যাদি। উপসর্গ-যোগে ল্যপ্ এবং অন্যথায় ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হবে— এই বিধির বহু ব্যতিক্রম সেখানে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে

'পূজ্য', 'প্রাপয়িত্বা', 'দৃশ্য' ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ-বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে 'জিজ্ঞাসন্তঃ', 'দিদৃক্ষন্', 'প্রেক্ষন্তঃ', 'চিন্তয়ান' ইত্যাদি প্রয়োগ দুর্লভ নয়।

মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে সমাসের অনিয়ম কম। মহাভারতের কয়েকটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ হিসেবে 'ধর্মরাজানম্', 'রথপন্থানম্' ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এছাড়া শিথিল সমাসবন্ধনদোষ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন "তস্য দর্শনতৃষ্ণাম্" ইত্যাদি।

পদক্রম বা বাক্যরীতির বিচারে বলা চলে রামায়ণ ও মহাভারতে ৫মীর অর্থে ৬ষ্ঠীর ব্যবহার এবং ৫মী-স্থলে তৃতীয়ার ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। একটি বিশিষ্ট উদাহরণ—

"প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ"। লৌকিক সংস্কৃতে অপেক্ষার্থে পঞ্চমী বিধান অনুসরণ ক'রে 'প্রাণেভ্যঃ' পদ শুদ্ধ। কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে বচনবিপর্যয়ও দেখা যায়। 'এনম্' 'ত্বা' ইত্যাদি বাক্যের আদিতে ব্যবহারের অযোগ্য পদসমূহ বাক্যের প্রারম্ভে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হ'য়েছে।

পুরাণের ভাষার এর চেয়ে বেশী নিজস্ব আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কয়েকটি শিথিল ও দুষ্ট ব্যাকরণগত প্রয়োগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে ভাষাতত্ত্বের বিচারে পুরাণের সংস্কৃতের কোন গুরুত্ব বা অভিনব ভূমিকা নেই ব'ললেই চলে। সুতরাং T. Burrow-কে উদ্ধৃত ক'রলে ব'লতে হয়—"Linguistically these compilations are not of great interest, except occasionally in the matter

of vocabulary, and many, particularly the later ones, testify to the deficient education of their authors in grammar."

সংক্ষেপে এইখানে সমাপ্ত হ'ল বৈদিক, লৌকিক ও ইতিহাস বা জানপদ সংস্কৃত ভাষার ভাষাগত বিচার, বিশ্লেষণ ও বিবরণপঞ্জী।

Ref. G. Shastri — History of Sans. Literature.
P. D. Gune — An Introduction to Comp. Phil.
Whitney — Sanskrit Grammar.
S. Sen — History & Pre-history of Sanskrit.
প. মজুমদার — সং. ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ
ধী. সাহা — ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা
T. Burrow — The Sanskrit Language.
Taraporewalla — Elements of the Science of Language

অষ্টম অধ্যায়

কথ্য-সংস্কৃত

ভারতীয় আর্য ভাষার, যাকে আমরা সাধারণতঃ 'সংস্কৃত' নামে চিহ্নিত ক'রে থাকি তার, বিভিন্ন স্তর ও উপস্তরের আলোচনা শেষ হ'য়েছে। এখন আমাদের সামনে উপস্থিত একটি বহু-বিতর্কিত প্রশ্ন : সংস্কৃত কি সত্যিই ভারতবর্ষের কথ্যভাষারূপে ব্যবহৃত হ'ত? অথবা তা ছিল শুধুই সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বাহনস্বরূপ লেখ্য বা সাহিত্যিক ভাষা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন—'সংস্কৃত' কিংবা 'প্রাকৃত' এই দুটি নামের কোনটিরই উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কোন ভাষারই নামকরণ প্রাচীন বৈয়াকরণ অথবা আলঙ্কারিকেরা ঐভাবে করেননি। বৈদিক এবং সংস্কৃত (অর্থাৎ পাণিনিসম্মত শিষ্টজনের ভাষা)—এই দুটিকে পাণিনি যথাক্রমে বৈদিক বা ছন্দস্ এবং ভাষা (প্রচলিত / কথ্য বাগ্‌ব্যবহার!) এই দুই নামে চিহ্নিত ক'রেছেন। বহু ব্যাকরণগত প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা পরিবেশন ক'রতে গিয়ে তিনি 'ছন্দসি' এবং 'ভাষায়াম্' এই শব্দ দুটি দিয়ে পার্থক্যের সীমারেখা সূচিত ক'রেছেন। উদাহরণস্বরূপ "ছন্দসি লিট্", "লিটঃ কানজ্ বা", "ক্বসুশ্চ", "ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ" (অষ্টাধ্যায়ী ৩-২-১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮) এই সূত্রক্রমের উল্লেখ করা যায়। অন্য নিদর্শন "বিচার্যমাণানাম্" (৮-২-৯৭), "পূর্বং তু ভাষায়াম্" (৮-২-৯৮) সূত্রদ্বয়।

উল্লিখিত নিদর্শনদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে উদ্দিষ্ট ভাষা যদি প্রচলিত বাগ্‌ব্যবহারের মাধ্যম অর্থাৎ সোজাভাষায় কথ্যভাষা না হ'ত তবে পাণিনি 'ভাষা' শব্দটিকে ব্যবহার ক'রতেন না। কারণ এতাবৎ সাহিত্যিক ভাষার রূপটি বিধৃত ছিল বৈদিক দেবভাষার মধ্যেই। লোকপ্রচলিত কথ্যভাষায় তার কিছু তারতম্য ঘটেছিল এবং তাকে ব্যাকরণের বিশ্লেষণের গণ্ডীভুক্ত ক'রতেই পাণিনির অসামান্য প্রয়াস। 'ভাষ্যতে ইতি ভাষা' এই ব্যুৎপত্তি হ'তেই ভাষা শব্দের দ্বারা যে কথ্যভাষাকেই বোঝানো হোত তার পরিচয় মেলে।

পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন লৌকিক ভাষা অর্থাৎ জানপদ অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রচলিত বা ব্যবহৃত ভাষণরীতিকে (current speech) নিয়ন্ত্রণ করাই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। লৌকিক শব্দের নির্বচন ক'রতে গিয়ে তিনি ব'লেছেন "লোকে বিদিত ইতি লৌকিকঃ" এবং পাশাপাশি বৈদিকের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন "বেদে ভব ইতি বৈদিকঃ"। ব্যাকরণের প্রয়োজন নির্দেশ ক'রতে গিয়ে তিনি ব'লেছেন—"রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।" অর্থাৎ—

(১) বেদের সংহিতাভাগকে অবিকৃতরূপে রক্ষা করা,

(২) প্রয়োজনমত অন্য প্রয়োগের সংগে সাধর্ম্য রক্ষা করে শুদ্ধ প্রত্যয়জাত প্রয়োগান্তর নির্ণয় করা,

(৩) স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন এবং তার অর্থ অনুধাবন,

(৪) অসংখ্য অশুদ্ধ শব্দ এবং বাগ্‌ব্যবহার হ'তে সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলার সংক্ষিপ্ততম পথরূপে একটি শুদ্ধ রূপ শেখা,

(৫) দ্ব্যর্থবোধক পদের অর্থানুধাবনের ক্ষেত্রে সংশয় দূরীকরণ —এই পাঁচটি ব্যাকরণের প্রয়োজন।

এছাড়াও স্বরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাকরণের শিষ্ট শুদ্ধ রূপটিকে গ্রহণ করা। 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে স্বর (accent) ভেদে অর্থান্তর ঘটে কেমন বিপত্তি বেধেছিল সেকথা আমরা শুনেছি।

উপরি-উক্ত বিবৃতি হ'তে এই ধারণা স্পষ্ট হয় যে প্রাচীন বৈদিক ভাষা ছিল প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির একমাত্র বাহক। তার সঠিক উচ্চারণ-পঠন-পাঠন-অনুধাবনে সদা রত ছিল ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়। ভারত-সংস্কৃতির সার্থক ভাববাহন এই ভাষা ছিল ভারতের জাতীয় ভাষা এবং তা কথ্য ভাষারূপেও ব্যবহৃত ব'লেই তা আঞ্চলিক উপভাষাগত বৈষম্যের শিকারও হ'য়েছিল। পণ্ডিত-পুরোহিত-উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা সর্বদা ভাষার শুদ্ধতম রূপটিকেই তাঁদের ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতেন ; কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐ ভাষাকে ব্যবহার করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, শিথিল বা ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ ক'রে ফেলতেন। সুতরাং ভারতের কথ্য ভাষা যে সংস্কৃতই ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় রাখা উচিত নয়। তবে তার দুটি স্পষ্ট ধারা প্রবাহিত ছিল।

বেদের ভাষার যে উপভাষাগত বিভাগ ছিল তার প্রমাণ ব্রাহ্মণে, নিরুক্তে এবং কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির ব্যাকরণে স্পষ্ট। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে ব'লছেন শুধু অর্বাচীনেরা নয় প্রাচীন কোন কোন ঋষিও "যদ্ বা নঃ তদ্ বা নঃ" পড়তে গিয়ে "যর্বাণঃ তর্বা ণঃ" পড়ে ফেলতেন। এছাড়া সাধারণ মানুষে তো 'শশ' স্থানে 'ষষ', 'পলাশ' স্থানে 'পলাষ', 'অরয়ঃ'-স্থানে 'অলবো' ইত্যাদি ভুল উচ্চারণ করতই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক স্থলেই বৈয়াকরণেরা

সাধুভাষার উচ্চারণের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে প্রথমে সংস্কার ক'রতে প্রয়াসী। কারণ সঠিক উচ্চারণ না ক'রলে ধর্মের সাধন বেদপাঠই নিষ্ফল হবে। কিন্তু যদি সেই ভাষা কথ্যভাষারূপে ব্যবহৃতই না হবে, তবে তার উচ্চারণে সাধারণ মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রসঙ্গ কেমন ক'রে আসবে ?

অতএব দেখা যাচ্ছে সাধু বৈদিক সংস্কৃতের পাশাপাশি বিবর্তিত হ'চ্ছিল কথ্য, জানপদ, শিথিলবন্ধযুক্ত ঘরোয়া সংস্কৃত। দুটিই সজীব এবং সদা-ব্যবহৃত ভাষা ; পার্থক্য শুধু একটি বিষয়ে ;— একটি রক্ষণশীল এবং পূর্বতন শুদ্ধ রূপকে অবিকৃত রাখতে প্রয়াসী, অপরটি লৌকিক পরিবর্তনের সংগে সংগতি রাখতে, বিজাতীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবকে মেনে নিতে, তথা আত্মসাৎ করতে এবং দ্রুততর তালে বিবর্তনে উন্মুখ।

কালক্রমে সাধু সংস্কৃত এবং কথ্য সংস্কৃতের মধ্যে বিভেদ বেড়ে উঠল। কথ্য সংস্কৃতে বহু দেশী, আঞ্চলিক এবং অনার্য শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটল। তা' লক্ষ্য করেই পতঞ্জলি খেদোক্তি ক'রেছেন "ভূয়াংসঃ অপশব্দাঃ"। যে ভাষা জনগণের মধ্যে প্রচলিত থাকে তার মধ্যে এই সর্বগ্রাহী রূপটি গড়ে উঠতে বাধ্য। অনভিজাত ভাষার প্রভাব থেকে শুদ্ধ আর্য বা শিষ্টসম্মত ভাষার ছাঁদটিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিতে পুনরায় প্রকাশ করাই পাণিনি-প্রমুখ বৈয়াকরণদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ্যে ব্যবহারের ফলে তার যে দোষ বা শিথিলতা দেখা দিয়েছিল তার সংস্কার অর্থাৎ এককথায় সকলপ্রকার বিশৃঙ্খলার দূরীকরণ ও অনিয়মিত ব্যবহারের প্রাচুর্যকে নিয়ন্ত্রিত ও সহজবোধ্য প্রয়োগরীতির একটি

সংকলন নির্ণয় করাই ছিল বৈয়াকরণদের মুখ্য প্রয়াস। সুতরাং পাণিনিনির্দিষ্ট ভাষাও জীবন্ত লোকভাষাই বটে। অন্যথায় উত্তেজিত হ'লে, দূর থেকে আহ্বান করার সময়ে অথবা ঠাট্টা-তামাসা করার সময়ে মানুষে কোন্ ভাষা বা কি-প্রকার অপ্রচলিত বাগ্‌বিন্যাস করে তার বিবৃতি তিনি কখনোই দিতেন না। সুতরাং পাণিনি-পূর্বযুগে ও পাণিনি-পতঞ্জলির সমসাময়িক কালেও যে ভাষা সাধারণ্যে কথ্যভাষারূপে ব্যবহৃত হ'ত তা সংস্কৃতই। কারণ, যাঁরা কথোপকথনের মাধ্যমরূপে সংস্কৃত ভাষাকে স্বাভাবিক ভাবে জানতেন বা ব্যবহার ক'রতেন তাদের জন্যই পাণিনি-পতঞ্জলি ভাষার শুদ্ধরূপটির একটি আদর্শ ছাঁদ (model) স্থাপন করেছেন।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে সমাজের প্রতিটি মানুষই একমাত্র সংস্কৃত ভাষাতে কথা ব'লত। বৈদিক যুগে কথ্য ভাষার যে স্বচ্ছন্দ বিবর্তনের ধারা এগিয়ে চলেছিল তার পরিণতিতে একদিকে ধর্মশাস্ত্র, কাব্য-নাটকের উপযোগী, ব্যাকরণশাসিত, শিষ্টজনসম্মত ভাষা 'সংস্কৃত' অনুশাসিত হ'ল ; অপরদিক সমাজের নিম্নকোটির মানুষের ভাষা দ্রুত-বিবর্তিত হ'য়ে পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশের জন্ম দিল। সমাজের শিক্ষিত উচ্চকোটির অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখ্য চলিত বা কথোপকথনের ভাষাও ছিল সংস্কৃত, অপেক্ষাকৃত অনভিজাত অথবা মধ্যম শ্রেণীরা হয়ত' ব্যবহার করতেন একই ভাষা, একটু উচ্চারণের দোষ বা কিছু শিথিল ব্যাকরণদুষ্ট পদপ্রয়োগসহকারে। তাতে পরস্পরের কথার অর্থ-অনুধাবন ক'রতে কারুরই কোন অসুবিধা হোত ব'লে মনে হয় না। বাংলা

দেশের কথ্য ভাষা "বাংলা"-ই, কিন্তু পূর্ববঙ্গ, রাঢ়দেশ, উত্তরবঙ্গ এবং নবদ্বীপের বাগ্‌ব্যবহারের বিভিন্নতার কথা কাউকে বুঝিয়ে ব'লতে হয় না। তবু তারা 'বাংলাভাষা'-র পরিবর্তে অন্য নামে পরিচিত নয়।

তবে সমাজের আরও নিম্নস্তরের মানুষের মুখে সে ভাষা আরও দ্রুত বিবর্তিত হ'য়ে অনেক পৃথক্ হ'য়ে গেল। অশোকের রাজত্বকালে রাজ-অনুশাসনসমূহ পর্যন্ত প্রাকৃতে প্রচারিত হ'ল। জনসমাজে অধিক জনপ্রিয় হবার আগ্রহে বৌদ্ধ ধর্মযাজকবৃন্দ তাঁদের শাস্ত্রসমূহকে বেশির ভাগ সময়েই পালিতে রচনা ক'রেছেন। কখনও বা ব্যবহার করেছেন মিশ্র অনভিজাত সংস্কৃত। সুতরাং অশোক এবং তার কিছু পূর্বেও হয়ত' পালি-প্রাকৃত গণসমাজের কথ্য ভাষা ছিল।

তবে তার জন্য একথা কখনই মনে করা উচিত নয় যে ভারতের কথ্য-ভাষা ছিল 'প্রাকৃত' এবং সাহিত্যিক এবং ধর্মের ভাষা ছিল 'সংস্কৃত'। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উভয়েই কথ্য ভাষা ছিল। পরবর্তী যুগে পাণিনি-অনুশাসিত সংস্কৃত কিছুটা কৃত্রিম (stereotyped) হ'য়ে যায়, ফলে প্রাকৃত-অপভ্রংশ এবং নব্যভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ বিবর্তিত হয়। কিন্তু তার পূর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে ভাষা সামান্য উপভাষাগত এবং আঞ্চলিক বা দেশজ শব্দ ও রীতির দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে শিষ্ট শিক্ষিত সমাজে বাগ্‌ব্যবহার ও কথোপকথনের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হ'ত তা 'সংস্কৃত', যাকে পাণিনি 'ভাষা' নামে চিহ্নিত ক'রেই বোঝাতে চেয়েছেন, এবং তা নিশ্চিত ভাবে সমাজের একটি অংশের একমাত্র চলিত বা কথ্য-ভাষা

ছিল। আঞ্চলিক টান (intonation), ধ্বনি-বিপর্যয় বা অনবধান-জনিত ভ্রম তার স্বরূপের হানি সূচিত করে না। তাই ভারতের সংস্কৃতির বাহন, অত্যন্ত অভিজাত এবং রাজসভার সাহিত্য-রচনার মাধ্যম ও ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের পবিত্র ভাষা হ'লেও, 'সংস্কৃত' ভারতের কথ্য-ভাষারূপেও স্বীকৃত ছিল।

Ref. G. Shastri — Hist. of Classical Sans. Literature
Keith. — Hist. of Sans. Literature
S. K. Chatterjee — Indo-Aryan and Hindi
প. মজুমদার — সং. ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ
ভট্টোজী দীক্ষিত — সিদ্ধান্তকৌমুদী
মহাভাষ্যম্ (পস্পশাহ্নিক)

নবম অধ্যায়

পালি-প্রাকৃত-ভাষার সাহিত্যিক মূল্যায়ন

মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রথম স্তরের নিদর্শন মেলে অশোক-শিলালিপিতে। সে ভাষা স্থানভেদে সেকালের চারটি উপ-ভাষার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়—(১) উদীচ্য বা উত্তরপশ্চিমা, (২) প্রতীচ্য বা দক্ষিণপশ্চিমা, (৩) প্রাচ্যমধ্যা ও (৪) পূর্বী বা প্রাচ্যা। এই অশোক-অনুশাসনের কথা বাদ দিলে মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রথম স্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন রক্ষিত হ'য়েছে পালি-ভাষায়।

'পালি'শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে নানা মতভেদ র'য়েছে। পংক্তি, পল্লী, প্রাকৃত, পর্যায়,পাঠ, পারিভাষা—প্রভৃতি যে কোন শব্দ হ'তেই এই শব্দটি উদ্ভূত হ'তে পারে। পালিভাষার উৎপত্তিস্থল সম্পর্কেও নানা বিতর্ক র'য়েছে।

পালিভাষার বিবর্তনের চারটি স্তর স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়ঃ—

(১) গাথা বা পদ্যাংশ। প্রাচীন এবং নবীন উভয় লক্ষণাক্রান্ত এই বিমিশ্র ভাষাতে বহু ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়। এই গাথাগুলি সম্ভবতঃ ভগবান্ বুদ্ধের সমসাময়িক কালের রচনা হ'তে সংগৃহীত।

(২) পিটকস্থ গদ্যের ভাষা। গাথার তুলনায় এই ভাষার আধুনিকতা এবং ব্যাকরণের আদর্শ (standard) লক্ষ্য করার মত।

(৩) পিটকোত্তর যুগের টীকা বা অন্য গ্রন্থের গদ্য ভাষা তৃতীয়

নিদর্শন। এই ভাষা ব্যাকরণের শুদ্ধতা রক্ষা করতে অত্যধিক প্রয়াসী হ'য়ে অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম হ'য়ে গেছে মনে হয়।

(৪) আরও পরবর্তী যুগের কৃত্রিমতাযুক্ত পদ্যের ভাষা।

পালিভাষার সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি হ'ল—বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটক, ধর্ম্মপদ, থেরীগাথা, ধনিয়সুত্ত, মিলিন্দপঞ্‌হো ইত্যাদি।

মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষার মধ্যস্তরে মুখ্যতঃ সাহিত্যিক প্রাকৃতের স্থান। সাহিত্যিক প্রাকৃতের পাঁচটি রূপকে বৈয়াকরণেরা বিশেষ-ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেগুলি হ'ল মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী ও অর্ধমাগধী। বস্তুতঃ প্রাকৃত বিভিন্ন জনপদের লোকভাষা থাকাতে তার মধ্যে আরও অসংখ্য দেশীয় রূপ ছিল। সেগুলিকে কেউ স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার ক'রেছেন, কেউ কেউ আবার মুখ্য-উপভাষার বিভাষা রূপে তাদের চিহ্নিত ক'রেছেন। ফলে আভীরী, আবন্তী, গৌড়ী, ঢক্কী, শাকারী, শাবরী ইত্যাদি নামগুলিও পাওয়া যায়।

সুতরাং ব্যাপক অর্থ ধ'রে প্রাকৃতের বিষয়-বৈচিত্র্য এবং বিভাগ এইভাবে করা যায়—

(১) ধর্মীয় প্রাকৃত—বৌদ্ধ এবং জৈনদের ধর্মোপদেশের প্রধান মাধ্যম।

(২) সাহিত্যিক প্রাকৃত—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী এবং বিভিন্ন উপভাষাসহ অপভ্রংশ।

(৩) নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত—মুখ্য এবং বিভাষা মিশ্রিত উক্ত পাঁচটি প্রাকৃত।

(৪) বৈয়াকরণগণ কর্তৃক উল্লিখিত এবং বিশ্লেষিত প্রাকৃত—এর মধ্যে উক্ত প্রাকৃত ভাষাগুলিই গৃহীত।

'প্রাকৃত' শব্দটি 'প্রকৃতি' শব্দজাত। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ নিয়ে মতপার্থক্য র'য়েছে। সাধারণ অর্থে 'প্রাকৃত' শব্দটির তাৎপর্য 'প্রকৃতি'র অর্থাৎ জনগণের সদা-ব্যবহৃত ভাষা; যেমন শিষ্টসমাজের 'শুদ্ধ' ভাষা 'সংস্কৃত'। সুতরাং প্রাকৃতভাষার অর্থ জনসাধারণের কথ্য ও বোধগম্য ভাষা—"প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধম্ ইতি প্রাকৃতম্", অথবা "প্রাকৃতজনানাং ভাষা প্রাকৃতম্।"

এবারে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যিক পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত—সাহিত্যিক প্রাকৃতের মধ্যে মাহারাষ্ট্রীর স্থান সর্বোচ্চ। স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যাপক লোপপ্রবণতার ফলে এই ভাষা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও ললিত। তাই গীতিকবিতায় ও সংস্কৃত নাটকের গীত-অংশগুলিতে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত অধিক ব্যবহৃত। আচার্য দণ্ডীর ভাষায়—"মাহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ"। পণ্ডিতপ্রবর A. C. Woolner তাকে দাক্ষিণাত্যের তরল সংগীতময় ভাষার সংগে তুলনা ক'রেছেন।

এই ভাষার বিখ্যাত রচনাগুলি হ'ল হালসাতবাহন রচিত বিখ্যাত গীতিকবিতাগুচ্ছ "গাহাসত্তসঈ" (গাথাসপ্তশতী), জয়বল্লভ বিরচিত 'বজ্জালগ্‌গং' (১৪শ শতক), প্রবরসেনের 'রাবণবহো' (রাবণবধঃ) বা 'দহমুহবহো' (দশমুখবধঃ) বা 'সেতুবন্ধ' মহাকাব্য। বাক্‌পতিরাজের ঐতিহাসিক কাব্য 'গউডবহো' (গৌড়বধঃ) মহাকাব্য সম্পূর্ণভাবে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' নামক সট্টকের গীত-অংশগুলিও এই ভাষার চমৎকার নিদর্শন।

(২) শৌরসেনী প্রাকৃত—শৌরসেনী মুখ্যতঃ গদ্যের ভাষা। কেবলমাত্র সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত এই ভাষা হ'ল নারী, বিদূষক, অশিক্ষিত পুরুষ, শিশু এবং অসুস্থ মানুষের মুখের ভাষা। বিশুদ্ধ প্রাকৃতে রচিত সট্টকজাতীয় নাটক 'কর্পূরমঞ্জরী'তে নায়কও এই শৌরসেনী ভাষা ব্যবহার ক'রেছেন। সম্ভবতঃ শৌরসেনী প্রাকৃতের মূল ভিত্তি ছিল শূরসেন বা মথুরা অঞ্চল—ভারতের সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। তাই সংস্কৃতভাষার সংগে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষিত হয়। প্রাকৃত ভাষাসমূহের মধ্যে শৌরসেনী সর্ববিষয়ে সর্বাধিক সংস্কৃতানুগ।

বৈয়াকরণেরা মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর মাঝামাঝি বিভাষা 'আবন্তী' প্রাকৃতের উল্লেখ ক'রেছেন। এতে দুটি প্রাকৃতেরই লক্ষণ পরিস্ফুট।

(৩) মাগধী প্রাকৃত—পূর্বী প্রত্যন্তদেশের প্রাকৃতের নাম মাগধী। অন্যান্য প্রাকৃতের চেয়ে এর কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। বিশিষ্ট ধ্বনি-পরিবর্তনে, অনিয়মিত সমীভবনে ও বিভিন্ন রূপগত বিষয়েও মাগধীর নিজস্ব কয়েকটি লক্ষণ আছে। ভাষাদর্শের বিচারে মনে হয় মাগধী মাহারাষ্ট্রীকে পরিহার ক'রে শৌরসেনীকেই অনুসরণ ক'রেছে। তাই প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা "প্রকৃতিঃ শৌরসেনী", "শেষং শৌরসেনীবত্" ইত্যাদি উক্তি ক'রেছেন।

সংস্কৃত নাটকে মাগধী অনভিজাত মানুষের ভাষা। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে ধীবর, কুম্ভীরক, রক্ষিপুরুষ প্রভৃতি এবং মৃচ্ছকটিকে (সামান্য পরিবর্তনসহ) শকার, চেট, জুয়াড়ী প্রভৃতির মুখে এই ভাষা শোনা যায়। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ মাগধীর কয়েকটি বিভাষার

উল্লেখ ক'রেছেন—যথা, শাকারী, শাবরী, চাণ্ডালী ইত্যাদি। হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক সময় মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হ'য়েছে।

(৪) অর্ধমাগধী প্রাকৃত—পালি যেমন বৌদ্ধ রচনাসমূহের প্রধান মাধ্যম, তেমনি অর্ধমাগধী ব্যবহৃত হ'য়েছে কেবল জৈনদের রচনাতে। স্বয়ং মহাবীর স্বামী এই ভাষাতে তাঁর বাণী প্রচার ক'রেছিলেন। জৈনধর্মাবলম্বী বৈয়াকরণেরা তাই একে 'আর্ষ' বা 'আর্ষপ্রাকৃত' এমন কি 'দেবভাষা' ব'লেও উল্লেখ ক'রেছেন। পণ্ডিতপ্রবর য়াকোবি (Jacobi) তাকে 'জৈনপ্রাকৃত' নাম দিয়েছেন। তাঁর মতে এই ভাষা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রাচীনতর রূপ। অশ্বঘোষের নাটকে অর্ধমাগধীর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালের সংস্কৃত নাটকে এর প্রয়োগ একেবারেই কমে যায়। অর্ধমাগধী ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য, এই ভাষার গদ্য ও পদ্য রচনার মধ্যে ধ্বনি ও রীতিগত পার্থক্য লক্ষিত হয়।

(৫) পৈশাচী প্রাকৃত—শিষ্ট সমাজের সাহিত্যে এর তেমন সমাদর না থাকলেও লোকসাহিত্যে এর খুবই জনপ্রিয়তা ছিল। কেউ কেউ একে 'ভূতভাষা', 'ভূতবচন', 'ভূতভাষিতম্' ইত্যাদি নামে অভিহিত ক'রেছেন। (তুলনীয় দণ্ডীর কাব্যাদর্শে—"ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্")। এর অনেকগুলি বিভাষার উল্লেখ আছে।

অভিজাত সাহিত্যের মাধ্যমরূপে পৈশাচী প্রাকৃত স্বীকৃতি লাভ না ক'রলেও অনভিজাত লোককথার অতুলনীয় আকর 'বৃহৎকথা' এই ভাষাতে রচিত হ'য়েছিল। রচয়িতা বিশিষ্ট কবি গুণাঢ্য। মূল

গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত হ'লেও তিনটি সংস্কৃত সংস্করণে (বুধস্বামীর "বৃহৎকথাশ্লোক-সংগ্রহঃ", ক্ষেমেন্দ্রের "বৃহৎকথামঞ্জরী" এবং সোমদেবের "কথাসরিৎ-সাগরঃ") তার নিদর্শন সংরক্ষিত হ'য়েছে।

মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষার তৃতীয় তথা শেষ স্তর অপভ্রংশ। অপভ্রংশ শব্দের প্রাচীন অর্থ ছিল অপাণিনীয় প্রয়োগ। এর অন্য নাম 'দেশভাষা', 'অপভ্রষ্ট', 'বিভ্রষ্ট', 'লৌকিক' ইত্যাদি। সাহিত্যে যখন প্রাকৃতের ব্যবহার প্রচলিত ছিল তখন জনসাধারণের কথ্য ভাষা বিবর্তিত হ'তে হ'তে এই রূপ গ্রহণ করে। অপভ্রংশের প্রাচীনতম উল্লেখ অস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি হ'ল ধনপালের ভবিসয়ত্তকহা (ভবিষ্যদত্তকথা), 'পউমচরিউ' (পদ্মচরিত্র), পুষ্পদন্তের 'যসহরচরিউ' (যশোধরচরিত্র), হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত' ইত্যাদি। অবহট্‌ঠ নামে সম্ভবতঃ এই ভাষাই উল্লিখিত হয়। তথাকথিত অবহট্‌ঠে রচিত কয়েকটি রচনারূপ হ'ল—রাজস্থানের পিঙ্গলসাহিত্য, সন্দেশরাসক, পিঙ্গলাচার্যের প্রাকৃত-পিঙ্গল; এবং শেষ পরিণতিরূপে সম্ভবতঃ ব্রজবুলী সাহিত্য।

'অপভ্রষ্ট' শব্দটি মুখ্যতঃ বিকৃত (degenerated) অর্থে প্রযুক্ত হ'য়েছে। পতঞ্জলির সময়েই অশুদ্ধ সংস্কৃতেতর ইতরজনোচিত বাক্-প্রয়োগকে 'অপভ্রংশ' বা 'অপশব্দ' নামে চিহ্নিত করা হ'য়েছে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনে অপভ্রংশের সঠিক স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে নানা বিতর্কের অবকাশ র'য়েছে। যাই হোক, ধ্বনিগত বিচারে গঠন ও শব্দভাণ্ডারে অপভ্রংশ প্রাকৃতাশ্রয়ী এবং রচনারীতি

ও রূপতত্ত্বে তা' দেশী ভাষার সংগে ঘনিষ্ঠ। এই দেশী ভাষা একদিকে অপভ্রংশের কথ্যরীতির, অপর দিকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের মূল উৎস।

Ref. A. C. Woolner Introduction to Prakrit.
S. Sen Comparative Grammar of M-I-A.
S. Sen ভাষার ইতিবৃত্ত
প. মজুমদার সং. ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ।
ধী. সাহা ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা।

দশম অধ্যায়

সংস্কৃতের উপর আর্যেতর ভাষাসমূহের প্রভাব

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের সামান্য বিবরণ নেওয়া হ'য়েছে। মনে রাখতে হবে ভাষা সাধারণ গণসমাজের সদা ব্যবহারের উপযোগী একটি সক্রিয় মাধ্যম। সুতরাং তার মধ্যে আন্তর পরিবর্তন যেমন ক্রমেই ঘটে, তেমনই বহিরাগত প্রভাবও তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। ভারতীয় আর্যভাষাতেও তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শব্দাবলী, নানা ব্যাকরণগত প্রয়োগ, বাক্যরীতির কয়েকটি বিশিষ্ট ভঙ্গী ও বাগ্‌ব্যবহারের প্রণালী ক্রমশঃ অনুপ্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ ভারতীয় আর্যেরই ভাষাগত বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে অভিন্ন-রূপে লক্ষিত হয়। একেই বলা হ'য়েছে ভারতীয় আর্যভাষার উপর অনার্য (অন্‌-আর্য) বা আর্যেতর ভাষার প্রভাব।

আর্যেতর প্রভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে ব'লতে হয় সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্ট নূতন মূর্দ্ধন্যবর্ণগুলি অনার্য-ধ্বনি-অনুপ্রবেশের সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর্যেতর সম্প্রদায় এবং গণসমাজগুলি আর্যভাষা-গুলিকেই তাদের ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যমরূপে স্বীকার ক'রে নেয় এবং কালক্রমে তাদের নিজস্ব ভঙ্গীতেই সংস্কৃত ভাষার মধ্যেও তাদের ভাষাগত ব্যাকরণ, কৃৎ-প্রত্যয়সমূহ, নানা ধাতু-রূপাদর্শ এবং শব্দরাজিকে সংমিশ্রিত ক'রে ফেলে। ভারতবর্ষের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষার এই বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব র'য়েছে। সংস্কৃত

ভাষার শব্দাবলী প্রধানতঃ ই-ইউ. গোষ্ঠীজাত। তার বাইরে যে সমস্ত শব্দ এই ভাষাতে দেখা যায় সেগুলির উৎস কোন না কোন আর্যেতর ভারতীয় ভাষা। প্রায়শই দেখা যায়, একটি পদার্থের বাচক একাধিক শব্দের মধ্যে একটি হয়ত' আর্য, অন্যটির উৎপত্তি আর্যেতর কোন ভাষা হ'তে। উদাহরণস্বরূপ—'অশ্ব' (আর্য)-'ঘোটক' (অনার্য) ; 'শ্বা' (আর্য)-'কুক্কুর' (অনার্য) ; 'মার্জার' (আর্য)-'বিড়াল' (অনার্য) ; 'ব্যাঘ্র' (আর্য)-'শার্দূল' (অনার্য), 'ঋক্ষ' (আর্য)-'ভাল্লুক' (অনার্য)। অন্য উদাহরণ সমার্থক মহিষবাচক 'কাসর', লুলায়, সৈরিভ, হেরম্ব ইত্যাদি।

এই সকল শব্দসমূহ ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বকালীন কোন ভাষা বা ভাষাগুচ্ছ হ'তে সংস্কৃতে সংগৃহীত হ'য়েছে। তবে ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্ব প্রত্যন্তের তিব্বতী-বর্মী (Tibeto-Burman) বা ভোট চীনীয় (Sino-Tibetan) ভাষা সংস্কৃতকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি। উত্তরপশ্চিমদেশীয় বুরুশাস্‌কী ভাষাবলীর প্রভাবও আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতীয় আর্যের অতি প্রাচীন স্তরে এরা তার শব্দভাণ্ডারকে সামান্য প্রভাবিত ক'রলেও তার পূর্ণ সমৃদ্ধ অবস্থায় তাদের বিলক্ষণতা মোটেই স্পষ্ট নয়।

কিন্তু ভারতের প্রাচ্য ভূখণ্ডের মুণ্ডা বা কোলভাষা অবশ্যই সংস্কৃতকে বেশ প্রভাবিত ক'রেছে। এদের সংগে যুক্ত র'য়েছে মোন্ খ্‌মের (Mon-khmer) উপভাষাসমূহ। ভারতে এখনও ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতালী এবং মুণ্ডা ভাষায় মানুষে কথা বলে। দক্ষিণ দিকের কথ্য ভাষা 'য়ুনাঙ্' (Yunang), 'শবর' এবং গডব। মধ্যপ্রদেশের নাহালী ভাষাসমূহ অপর একটি সদৃশ

গুচ্ছ। এই ভাষাগুলি সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং সংস্কৃতের উপর তাদের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

যাই হোক উপরি-উক্ত ভাষাগুলিকে অষ্ট্রিক বা অষ্ট্রো-এশীয় (Austro-Asiatic) নামে একটি ভাষার প্রশাখা ব'লে অনুমান করা হ'য়েছে। এই অষ্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সংস্কৃত শব্দের মূল উৎস সন্ধান করা যায়। যেমন মালয়ী ভাষায় ম্যেন্-তঙ্গ্ (main-tong)=হাতী, সংস্কৃতে মাতঙ্গ। শুধু ধ্বনিগত নয়, উল্লিখিত উদাহরণে রূপতত্ত্বগত প্রভাবও যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়। অষ্ট্রিক ভাষাবলীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য উপসর্গযোগে পদগঠন। মালয়ী ভাষাতে tong=হাত, সুতরাং maintong=হস্তী, তুলনীয় সংস্কৃত হস্তী; উভয়ত্রই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হস্তবিশিষ্ট। অন্য উদাহরণ অষ্ট্রিক 'সের্-ঙ্কলা' (ser-ṅkala), সং. শৃঙ্খলা; অথবা সং. 'অঙ্গনা', অষ্ট্রিক এঙ্-কান (en-kāna) ইত্যাদি। জাভাদেশী লৱন্ (lawan) শব্দ হ'তেই নিশ্চয়ই ভারতীয় আর্যে 'লবঙ্গ' শব্দের উদ্ভব। কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণের তালিকা নীচে বিশ্লেষিত হ'ল ঃ—

সং. 'অলাবু', মালয়ী. 'লাবু', মোন্-খ্মের. 'লৃবো';
সং. 'কদলী', নিকোবরী. 'তলুই', মোন্-খ্মের. 'তলই';
সং. 'কার্পাস', মালয়ী. 'কাপাস্';
সং. 'তাম্বুল', মুণ্ডা. 'জাব্লু', কোটাঙ্. 'তাম্বু';
সং. 'লাঙ্গল', মালয়ী. 'তাঙ্গল', মোন্-খ্মের. 'অঙ্কল';
সং. 'সর্ষপ', মালয়ী. 'সৈসৱী' (sesawi)।

অষ্ট্রিকগোষ্ঠীজাত ব'লে অনুমিত অন্যান্য কয়েকটি শব্দ হ'ল—

কুব্জ, লিঙ্গ, পুণ্ডরীক, লোল, গ্রাস, চিপিট, নারিকেল, উডুম্বর, শাল্মলী, তীর, কবরী ইত্যাদি।

সংস্কৃত-শব্দভাণ্ডারকে সর্বাধিক প্রভাবিত ক'রেছে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী। চারটি প্রধান ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—তামিল, তেলেগু, মালয়লম্ এবং কানাড়ী (কর্ণাটক)। এই চারটি ভাষার প্রায় ২০০০ বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্যসম্পদ তাদের সাহিত্যিক মানকে উন্নত রেখেছে। সাহিত্যিক মূল্যের নিরিখে অনধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবিড়গোষ্ঠীভুক্ত ভাষার সংখ্যাও অনেক—দক্ষিণ প্রদেশের টুলু, টোডা এবং কুর্গ্ ভাষা, মধ্যভাগের কোণ্ডা, পেঙ্গো, কুই ইত্যাদি এবং উত্তর ভাগের মাল্টো, ব্রাহুই ইত্যাদি। সংস্কৃতের মূর্দ্ধন্যবর্গ (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্) দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রভাবের ফল। এছাড়া রূপতত্ত্বের বিচারে বলাযায় ঘটমান অসমাপিকার (Gerund) ব্যবহার সম্ভবতঃ ই-ইউ. হ'তে সংস্কৃতে অনুসৃত নয়; দ্রাবিড় ভাষা-সমূহের এই বিশেষ লক্ষণটিকে সংস্কৃত ক্রমশঃ আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে। সংস্কৃত শব্দরাজির উপর দ্রাবিড়-ভাষা-গোষ্ঠীর অপরিসীম প্রভাব নীচের তালিকার নিরিখে অত্যন্ত স্পষ্ট হ'তে পারে—

১।	সং.	অগুরু	৩।	সং.	অলস
	তামিল.	অকিল্		কা.	অলস্থ
	টুলু.	অগিলু			
২।	সং.	অনল	৪।	সং.	কঠিন
	তা.	অনল্		তা.	কঠ্
	মালয়ালী	অনল্		টু.	গট্টি
	কানাড়ী	অনলম্			

৫।	সং.	কাক	৭।	সং.	কুন্তল
	তা.	কাক্কই		তা./মা.	কুন্তল্
	মা.	কাক্ক		কা.	কুণ্ডল্
	ব্রাহুই.	খাখ			
৬।	সং.	কুটিল	৮।	সং.	চন্দন
	তা.	কোটু		মা.	চণ্টু
	মা.	কোটু		টু.	চাণ্টু
	কা.	কুডু		তেলেগু.	চডু

সংস্কৃতের মধ্যে দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীজাত অন্যান্য শব্দের মধ্যে আছে—কজ্জল, মীন, পল্লী, নক্র, বক, পণ্ডিত, মুকুট, আরভট, নিবিড়, শঠ, পণ্ড, চিক্কণ, কোটর, পিটক, পিণ্ড, পুট, মুরজ, মুরলী ইত্যাদি।

তবে দ্রাবিড়ীয় হোক বা অষ্ট্রো-এশীয় হোক, তাদের প্রভাবের পরিধি এবং পরিমাপ সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া আজও সম্ভব নয়। কারণ এই সম্পর্কে অধিকাংশ বিষয় এখনও গবেষণা-সাপেক্ষ। উল্লিখিত ভাষাসমূহের ভাষাদর্শ এবং ব্যাকরণের সঠিক ছাঁদটি (pattern) সম্পর্কে নির্ভুল পর্যালোচনা ব্যতিরেকে এই তুলনামূলক এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

যাই হোক্, সুধীসমাজের সিদ্ধান্ত অনুসারে অধিকাংশ দ্রাবিড় শব্দ বেদোত্তর যুগেই আর্যভাষার মধ্যে সংমিশ্রিত হ'য়েছিল। যার ফলে বৈদিক সাহিত্যের চেয়ে ধ্রুপদী সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার ধ্বনি ও শব্দগঠনে তার প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। ধ্রুপদী সংস্কৃতে যে আর্যেতর ভাষার অনুপ্রবেশ এবং সংমিশ্রণ ঘটেছিল

তার বিবরণ আমরা শ্রৌতসূত্রে, পাণিনি-পতঞ্জলির ব্যাকরণে এবং অন্যান্য গ্রন্থে পাই। সুতরাং ঐ সময়ে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ-সূত্র বর্তমান ছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে খ্রীষ্টযুগের বহু পূর্ব হ'তেই দ্রাবিড় বা অন্য আর্যেতর ভাষার নানা লক্ষণ এবং শব্দ ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। পালি-প্রাকৃতে তারা ক্রমবিবর্তিত হয়, নতুন শব্দরাশিও অনুকৃত হয়। তবে বৈদিক সাহিত্যে উলূখল, দণ্ড, ময়ূর, খল প্রভৃতি সংহিতায় প্রাপ্ত শব্দরাজি, অথর্ববেদের তূল, বিল্ব, শূর্প প্রভৃতি শব্দ এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মঙ্কু, শব প্রভৃতি শব্দ আর্যেতর প্রভাবজাত ব'লেই অনুমিত হ'য়েছে।

উপসংহারে অনুমান করা যায় বৈদিক যুগের অন্ত্যপর্ব এবং ধ্রুপদী সংস্কৃতের আত্মপ্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে সংস্কৃত ভাষার উপরে দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব সর্বাধিক সংক্রমিত হ'য়েছে। এ বিষয়ে অপেক্ষিত আরও ব্যাপক এবং বিশদ গবেষণা হয়ত' ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের আর এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

ভারতীয় আর্য ভাষার মূর্দ্ধন্যবর্গের উৎস

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্য কোন ভাষায় ভারতীয় আর্যের মূর্দ্ধন্য-বর্গীয় (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্) বর্ণগুলির অস্তিত্ব নেই। ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে এই বর্ণগুলিকে তাড়িত ব্যঞ্জন বলা হয়, কারণ জিহ্বাকে বিপরীতমুখে আবর্তিত ক'রে তালুর কঠিন অংশ বা মূর্দ্ধাকে আঘাত ক'রে এই বর্ণসমষ্টিকে উচ্চারণ ক'রতে হয়। এই সম্পর্কে পণ্ডিতবৃন্দের সুচিন্তিত অভিমত, ভারতে আর্যদের আগমনের অর্থাৎ মূল ই-ইউ হ'তে এবং তার পরে ইন্দো-ইরাণীয় ভাষা হ'তে

বিচ্ছিন্ন হবার পরে ভারতীয় আর্যভাষাতে এই নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষে আর্য্যেতর ভাষাগুলির প্রত্যেকটিতেই এই প্রকার ধ্বনি রয়েছে। তাদের মধ্যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাই এই মূর্দ্ধন্যীভবনের বিষয়কে সর্বাধিক প্রভাবিত ক'রেছে ব'লে অনুমান করা যায়।

ভারতীয় আর্যে বিবর্তিত মূর্দ্ধন্যবর্ণসমষ্টির অনুমিত উৎসগুলিকে এ'ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়—

(১) ইন্দো-ইরাণীয় হ'তে ভারতীয় আর্যে বিবর্তিত হবার পথে কোন শব্দের অন্তর্বর্তী সঘোষ শিস্‌ধ্বনি জ়্ (z') লুপ্ত হ'লে তার পরবর্তী দন্ত্যবর্ণ মূর্দ্ধন্যীভূত হ'য়েছে। যেমন—ই. ইউ. * নিজ়্দোস্ (nizdos) > ই. ইরা. নিজ়্দস্ (niz'das) > সং. নীড়ঃ।

(২) ষ্-ধ্বনির (<আর্য শ্-ś) অব্যবহিত পরবর্তী দন্ত্য বর্ণ ত্ মূর্দ্ধন্যীভূত হয়ে ট্-তে পরিণত হ'য়েছে। যথা— √বৃষ্ + তি = বৃষ্টি। [স্মরণীয় পাণিনি সূত্র. "ষ্টুনা ষ্টুঃ"]

(৩) সংযুক্ত ব্যঞ্জন ষ্ষ্ (ṣṣ) হ'তে মূর্দ্ধন্য 'ট্ষ্' উৎপন্ন হয়। [মনে রাখতে হবে এই 'ষ্ষ্'-র উৎস ś + s অথবা ই. ইরা. ṣ + ṣ'] পদান্ত যুগ্ম ব্যঞ্জনের শেষেরটির লোপের ফলে অবশেষে 'দ্বিট্' (দ্বিষ্ + স্), 'বিট্' (বিশ্ + স্) ইত্যাদি শব্দ উৎপন্ন।

(৪) একই পদস্থিত ঋ, র্, ষ্-এর পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্দ্ধন্য 'ণ'-তে পরিণত হয়, যদি কোন তালব্য বা দন্ত্য বর্ণ তাদের বিচ্ছিন্ন না করে। যেমন—'করণ'. 'কারণ', 'শ্রবণ', 'ঋণ' ; কিন্তু 'কৃতান্ত', 'দর্শন' ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত নিয়মাবলী অনুসারে সংস্কৃতভাষার স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্যীভবনের রীতি ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু এদের দ্বারা শব্দের আদিস্থিত এবং স্বরমধ্যগত (intervocalic) মূর্দ্ধন্যবর্ণের বিবর্তনের ব্যাখ্যা মেলে না। ভারতীয় আর্যের স্বরমধ্যগত তাড়িত-ব্যঞ্জন সম্পর্কে রুশী ভাষাবিজ্ঞানী ফর্তুনাতোভ্ একটি ধ্বনিসূত্র প্রণয়ন করেন। এই সূত্রের বক্তব্য—পদমধ্যগত পরস্পর সন্নিহিত 'ল্' ও 'ত্' ধ্বনির মধ্যে 'ল্'-ধ্বনির লোপের ফলে পরবর্তী দন্ত্যবর্ণের মূর্দ্ধন্যীভবন ঘটে। উদাহরণ—

ই. ইউ. * পোল্‌তো (polto)>সং. পট,

ই. ইউ. * কুল্‌থেরো (kulthēro)>সং. কুঠার ইত্যাদি।

কিন্তু Brugmann, Bartholomae প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা এই সূত্রকে স্বীকার করেন নি। তাঁরা এ' বিষয়ে দুটি তত্ত্ব উপস্থাপিত ক'রেছেন। (১) মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাতে 'ঋ' বা 'র্' ধ্বনির প্রভাবে মূর্দ্ধন্যীভবন দেখা যায়। এবং তার প্রভাববশতঃ সংস্কৃতভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। সুতরাং √নৃত্>নট, অবৃত> অবট ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। তুলনীয় অপর উদাহরণ ভৃত্য>ভট, কৃত>কট, বিকৃত>বিকট ইত্যাদি। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঋ-বর্ণের লোপের ফলে তার অব্যবহিত পরবর্তী দন্তবর্ণ মূর্দ্ধন্যীভূত হ'য়েছে। এই জাতীয় অন্য উদাহরণ—হাটক (=সোনা), অটনি, আঢ্য (< √ঋধ্) ইত্যাদি।

দন্ত্যবর্ণের পরস্থিত র্-ধ্বনির লোপের ফলেও মূর্ধন্যীভাব দেখা যায়; যদিও তার প্রয়োগ খুবই অল্প। যেমন 'অণ্ড', প্রাকৃতে 'খেট' (<সং. ক্ষেত্র) ইত্যাদি।

আপাততঃ স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত মূর্দ্ধন্যীভবনেরও কিছু উদাহরণ দেখা যায়। যেমন, স্থূণা (তুলনীয় আবেস্তীয় স্থূনা), বীণা, স্থাণু, আণি, পাণি, পুণ্য ইত্যাদি।

(২) দ্বিতীয়তঃ, দ্রাবিড়গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা হ'তে আহরিত বা অনুকৃত সংস্কৃত-শব্দসমূহে এই প্রকার মূর্ধন্যীভাব দেখা যায়। যেমন —কুটিল, কঠিন, কটু ইত্যাদি।

তবে টীকা, ডমরু, ঢক্কা, ডঙ্কা প্রভৃতি শব্দে দৃষ্ট শব্দের আদিস্থিত মূর্ধন্যবর্ণসমূহের উৎস সম্পর্কে কোন সঠিক কারণ ও ব্যাখ্যা এখনও করা যায় নি। অবশ্য প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যভাষার প্রথম স্তরে এই ধরণের শব্দ প্রায় ছিল না বললেই চলে। ওই স্তরে ভারতীয় আর্যভাষাতে মূর্ধন্যবর্ণের ব্যবহারই ছিল নেহাৎই কম। দ্রাবিড় ভাষাতেও শব্দের আদিতে মূর্ধন্যবর্ণের ব্যবহার নেই। সুতরাং এ' তার প্রভাবজাত নয়। নব্য-ভারতীয় আর্যে পদের আদিতে মূর্ধন্যবর্ণের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। আজও এই ভাষার শব্দভাণ্ডারের বহু শব্দের বিবর্তনের সুস্পষ্ট ধারাপথ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

Ref. **T. Burrow.** **The Sans. Language.**
Taraporewalla. **Elements of the Science of Language.**
P. D. Gune. **An Introduction to Comp. Philology.**

একাদশ অধ্যায়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংস্কৃত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার গঠন-প্রকৃতি ও ধ্বনিসমূহের পরিচয় আগেই নিয়েছি। তার উপভাষাগত বিভাগ এবং প্রধান দশটি শাখার সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা হ'য়েছে। এখন সেই ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে যৎসামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। ই-ইউ. ভাষাতত্ত্বের নিরিখে ভাষাগুলির পরস্পরের সংগে সম্বন্ধ নিম্নরূপ ঃ—

(১) রূপতত্ত্বের ব্যাপারে ইন্দো-ইরাণীয়, গ্রীক এবং লিথুয়ানীয় পরস্পর ঘনিষ্ঠ।

(২) গ্রীক শাখাতে ই-ইউ. স্বরবর্ণসমূহ সর্বাধিক অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হ'য়েছে এবং সংস্কৃতে বা ভারতীয় আর্যে ই-ইউ. ব্যঞ্জন-বর্ণগুলি সর্বাধিক অবিকৃতরূপে দৃষ্ট।

(৩) ধ্বনিগত-অপশ্রুতি-রূপতত্ত্বগত আলোচনায় এর পরেই জার্মানিক ও শ্লাভীয় ভাষাগুচ্ছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) ইতালীয় ও কেল্‌তিক অত্যন্ত প্রাচীন ভাষা ; এদের বিবর্তনের ধারা অত্যন্ত জটিল ও অস্পষ্ট। এ সম্পর্কে গভীর গবেষণা এখনও অপেক্ষিত।

(৫) তুখারীয় এবং হিট্টীয় ভাষার সঠিক রূপনির্ণয় ও ধ্বনি-বিচার ও তাদের বিবর্তনের ইতিহাস আজও গবেষণাসাপেক্ষ।

(৬) আর্য (=ইন্দো-ইরাণীয়), আর্মেনীয়, আল্‌বানীয় এবং বাল্‌তো-শ্লাবিকে ই-ইউ. কণ্ঠতালব্য (palatal gutteral) র্ক্ (k̂) শিস্‌ধ্বনিতে অর্থাৎ 'শ্' অথবা 'স্'-তে পরিণত। অন্য ছয়টি শাখায় তারা কণ্ঠ্যবর্ণ অর্থাৎ ক্-ধ্বনিরূপেই রক্ষিত হ'য়েছে। [শতম্ ও কেন্তুম্ গুচ্ছের আলোচনায় উদাহৃত শব্দগুলি লক্ষ্য কর]

(৭) ই-ইউ 'ও' (o)-ধ্বনি হিট্টীয়, আর্য, জার্মানিক, আল্‌বানীয় এবং বাল্‌তিক্-ভাষাতে রূপান্তরিত হ'য়েছে 'অ' (a)-ধ্বনিতে।

(৮) বৈদিক, গ্রীক এবং বাল্‌তোশ্লাবিকে স্বরসঞ্চার (musical accent) রক্ষিত, কিন্তু অন্য কয়েকটি ভাষায় শ্বাসাঘাত (stress accent) দৃষ্ট।

রূপতত্ত্বের বিচারে বলা যায়—

(১) সংস্কৃত, গ্রীক ও বাল্‌তোশ্লাবিকে দ্বিবচন আছে।

(২) গ্রীক, আর্য এবং আর্মেনীয়তে আগম-উপসর্গ (augment) রক্ষিত আছে।

(৩) কর্ম-কর্তৃবাচ্যে ধাতুরূপ গঠনে 'র্' (r)-ধ্বনির ব্যবহার আর্য, তুখারীয়, ইতালীয়, কেল্‌তিক এবং হিট্টীয়তে লক্ষিত।

(৪) সম্পন্ন (লিট্) এবং সামান্য অতীত (লুঙ্) একাকার হ'য়ে ধাতুর নতুন অতীত রূপ সৃষ্ট হ'য়েছে ইতালীয়, কেল্‌তিক এবং জার্মানিকে।

(৫) কারকের ব্যবহার প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই আছে। তবে তার সংখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন। আর্যশাখায় মূল ভাষার ৮টি কারকই (সম্বোধন ও সম্বন্ধ নিয়ে) রক্ষিত, কিন্তু গ্রীক্, ইতালীয়, কেল্‌তিক, এবং জার্মানিকে মাত্র ৫টি, আল্‌বানীয়তে ৪টি এবং

শ্লাভীয় শাখায় ৭টি কারক রক্ষিত। অনুমান করা হয় তুখারীয়তে কারক মাত্র ২টি ছিল ; তবে হিট্টীয়তে ছিল ৬টি।

(৬) বিভক্তির রূপগঠনের যেটুকু নিদর্শন বিশ্লেষিত হ'য়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৪র্থী ও ৫মীর বহুবচনে আর্য, ইতালীয়, গ্রীক, আর্মেনীয় ও কেলতিকে 'ভ্'-(bh) উপাদান, কিন্তু জার্মানিক ও শ্লাভীয় তা হ'য়েছে 'ম্' (m)-উপাদান।

(৭) মূল ই-ইউ. ভাষার তিনটি লিঙ্গ সর্বত্র রক্ষিত না হ'লেও ভারতীয় আর্য, জার্মানিক প্রভৃতিতে তা অনুসৃত হ'য়েছে।

(৮) ইতালীয়, গ্রীক এবং লেতিশ্ ভাষায় প্রথমা বহুবচনে (Nominative plural)—'ওই' (oi) এবং 'এই' (ei) বিভক্তি হয়।

(৯) ধাতুরূপে অনুজ্ঞা (Imperative) প্রথমপুরুষ বহুবচনে গ্রীক, ইতালীয় এবং আর্য শাখার বিভক্তির সৌসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। বিভক্তিটি ওন্তো (onto) এবং অন্ত।

ই-ইউ. ভাষাগোষ্ঠী একটি ব্যাপক, বিচিত্র ও জটিল ভাষা পরিবার। এই ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ভাষাই অপর ভাষার সংগে একাধিক বিষয়ে সংগতি এবং অসংগতি রক্ষা ক'রে বিবর্তিত হ'য়েছে। সুতরাং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক পরিচয় প্রদান করা একটু বিস্তারিত এবং জটিল আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বহু বিষয় আজও গবেষণাসাপেক্ষ ব'লে এই আলোচনা আরও দুরূহ। স্বল্প পরিসরে এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব ব'লেই বিবেচিত।

ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ পরিচয় তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হ'য়েছে। তারই বিষয়ে একটি বিশদ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার

অবতারণা প্রয়োজন। সে বিষয়ে রূপতত্ত্ববিষয়ক পর্যালোচনা প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হ'য়েছে। আপাততঃ মূল ই-ইউ. ভাষা হ'তে তার ধ্বনিসমূহের বিবর্তনের বিবরণ লক্ষ্য করা যাক।

ই-ইউ. * অ, এ, ও (a, e, o) > সং. অ।

যথা ই-ইউ. * অপো (apo) > সং. অপ

" * এস্তি (esti) > সং. অস্তি

" * প্রোতি (proti) > সং. প্রতি

ই-ইউ. দীর্ঘ * আ, এ́, ও́ (ā, ē, ō) > সং. আ.।

যথা ই-ইউ. * দোনম্ (dōnom) > সং. দানম্

" * মার্তের্ (mātēr) > সং. মাতা

" * অগো (agō) > সং. অজা

ই-ইউ. * ই (i) এবং 'ঈ' (ī) > সং. 'ই', 'ঈ'।

যথা ই-ইউ. * ক্বিদ্ (qʷid) > সং. চিত্

" * ৱীরোস্ (u̯īros) > সং. বীরঃ

ই-ইউ. * উ (u) এবং ঊ (ū) > সং. 'উ' ও 'ঊ'

যথা ই-ইউ. * মেধু (medhu) > সং. মধু

" * নু (nu) > সং. নু

" * ধূমোস্ (dhūmos) > সং. ধূমঃ।

ই-ইউ. অর্ধব্যঞ্জন ঋ, ঌ (r̥, l̥) > সং. ঋ, ঌ।

যথা ই-ইউ. * ঋক্থোস্ (r̥kθos) > সং. ঋক্ষঃ

" * ভৃতো (bhr̥to) > সং. ভৃত

" * মৃতো (mr̥to) > সং. মৃত

" * ৱ৯ক্বোস্ (u̯l̥qʷos) > সং. বৃকঃ।

ই-ইউ· অনুনাসিক অর্ধব্যঞ্জন ম্, ন্ (m̥, n̥) > সং· অ।
" " দীর্ঘ অর্ধব্যঞ্জন ম্̄, ন্̄ (m̥̄, n̥̄) > সং. আ।

যথা ই-ইউ· * ম্ন্তো (mn̥to) > সং মত
" * গ্ ম্তো (gʷm̥to) > সং. গত।

ই-ইউ. অতিহ্রস্ব স্বর ə (schwa) > সং. 'ই'.

যথা ই-ইউ. * pətēr > সং. পিতা

ই-ইউ সন্ধ্যক্ষর এই, ওই, অই (ei, oi, ai) > সং· 'এ'

যথা ই-ইউ. * ৱেইদোস্ (u̯eidos) > সং বেদঃ
" * তোই (toi) > সং· তে
" * √অইধ্ (aidh) > সং· √এধ্

ই-ইউ· সন্ধ্যক্ষর এউ, ওউ, অউ (eu, ou, au) > সং. ও

যথা ই-ইউ. * ভেউধোমাই (bheudhomâi) > সং. বোধামি
" * অউগ্-(aug) > সং. ওজঃ
" * লোউকোস্ (louqos) > সং· লোকঃ

ই-ইউ· দীর্ঘ সন্ধ্যক্ষরগুলি অর্থাৎ ēi, ōi, āi এবং ēu, ōu, āu সংস্কৃতে কখনও 'ঐ', 'ঔ'-তে পরিণত কখনও বা 'আ'-তে পরিণত।

যেমন ই-ইউ * নাউস্ (nāus) > সং· নৌঃ
" * ৱ্ল্ক্বোইস্ (u̯l̥qʷōis) > সং· বৃকৈঃ

আবার " * রাইস্ (rāis) > সং· রাঃ (=ধন)

ই-ইউ· অর্ধস্বর য্ ৱ, (i̯, u̯) > সং. য্, ৱ (অন্তঃস্থ)

যথা ই-ইউ· * যোস্ (i̯os) > সং. 'যঃ'
" * ত্রেয়েস্ (trei̯es) > সং. ত্রয়ঃ।
" * ৱীরোস্ (u̯iros) > সং. ৱীরঃ
" * ৱ্ল্ক্বোস্ (u̯l̥qʷos) > সং· বৃকঃ

ই-ইউ. ব্যঞ্জনগুলি সংস্কৃতে মোটামুটি অবিকৃত ভাবেই দৃষ্ট।

ই-ইউ. প্ (p) > সং. প্। যথা ই-ইউ. * প্রো > সং. প্র।
প্রতি, পরি-র বিশ্লেষণ আগেই প্রদত্ত।

ই-ইউ ফ্ (ph) > সং. ফ্। এ বিষয়ে বহু মতবৈষম্য র'য়েছে।
মতান্তরে সং. ফ্ < ই-ইউ. * স্প (sp)

ই-ইউ. ব্ (b) > সং. ব্। যথা ই-ইউ. * পিবেতি (pibeti) >
সং. পিবতি।

ই-ইউ. ভ্ (bh) > সং. ভ্। যথা ই-ইউ. * নেভোস্ (nebhos)
> সং. নভঃ।

তুলনীয় উদাহরণ 'ভৃত' আগেই প্রদত্ত।

ই-ইউ. 'ভ্' কখনও সংস্কৃতে 'হ'-তে পরিণত। যথা—
" * ঘ্রে়ভ্ > প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বেদে "গ্রভ্",
তুলনীয় বৈদিক প্রয়োগ 'গৃভ্ণাতি', 'জগ্রাভ'।
কিন্তু সংস্কৃতে 'গৃহ্ণাতি', 'জগ্রাহ' ইত্যাদি।

ই-ইউ. ত্, থ্, দ্, ধ্ (t, th, d, dh) > সং. ত্, থ্, দ্, ধ্

যথা ই-ইউ. * tənu > সং. তনু
" * ত্রেয়েস্ (treies) > সং. ত্রয়ঃ
" * বোইত্থ (uoittha) > সং. বেত্থ
" * সেদোস্ (sedos) > সং. সদঃ (= আসন)
" * দেকম্ (dekm) > সং. দশ
" * ধূমোস্ (dhūmos) > সং. ধূমঃ
" * মেধু (medhu) > সং, মধু

ই-ইউ. ধ্ (dh) সংস্কৃতে কখনও 'হ'-তে পরিণত। যথা—
" * √ধে (dhē) + তোস্ (tos) > সং. হিত। বেদে 'সুধিত' পদও পাওয়া গেছে।

ই-ইউ. কণ্ঠতালব্য ক্, গ্, ঘ্, সংস্কৃতে যথাক্রমে শ্, জ্ ও হ্-তে পরিণত। ক্ (k̑) > শ্-এর উদাহরণ শতম্ ও দশ পূর্বে প্রদর্শিত।

" * গ্ (ĝ) > সং. জ্।
যথা ই-ইউ. * গেনোস্ (ĝenos) > সং. জনঃ।
" * ঘ্ (ĝh) > সং. হ্। যথা
" * ঘেইমেন্ (ĝheimen) > সং. হেমন্।
" * ঘন্সোস্ (ĝhansos) > সং. হংসঃ।

ই-ইউ. পশ্চাৎকণ্ঠ্য (velar) এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য (labio velar) ক্, গ্, ঘ্ ও ক্ব্, গ্ব্, ঘ্ব্ সংস্কৃতে যথাক্রমে ক্, গ্, ঘ্-তে পরিণত। কিন্তু তালব্যস্বর বা উজ্জ্বল স্বর (bright vowels, heller vokalen) ই, ঈ, এ, এ́ (i, ī, e, ē) এবং অর্ধস্বর য়্, ৱ্ (i̯, u̯)-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী এই ধ্বনিগুলি সংস্কৃতে যথাক্রমে 'চ্', 'জ্' ও 'হ্'-তে পরিণত। যথা ই-ইউ. * কারুস্ (qārus) > সং. কারুঃ।

কিন্তু " * কুকিস্ (k̑uqis) > সং. শুচিঃ।
ই-ইউ. * ক্বোস্ (q^wos) > সং. 'কঃ'।
কিন্তু " * ক্বিদ্ (q^wid) > সং. 'চিত্'।
" * অউগেস্ (auges) > সং. ওজঃ
কিন্তু " * য্উগোম্ (i̯ugom) > সং. যুগম্।
" * গ্ব্ম্তোস্ (g^wm̥tos) > সং. গতঃ

কিন্তু " * গ্বীয়ো (gwiuo) > সং. জীব।

" * ঘে্বানোস্ (gwhonos) > সং. ঘনঃ

কিন্তু " * ঘে্বন্মি (gwhenmi) > সং. হন্মি।

ভাষাবিজ্ঞানী কোলিত্স্ (Collitz) এই বিষয়টি লক্ষ্য ক'রে তাকে সূত্রাকারে বিন্যস্ত করেন। তাই এ'কে কোলিত্স্-এর ধ্বনিসূত্র (Collitz's Law) বলা হয়।

গ্রীক ও সংস্কৃতের আন্তর সাদৃশ্য

ই-ইউ. ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ভাষা গ্রীক কেন্তুম্ গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও তার বিস্তৃত ব্যাকরণের কাঠামো সংস্কৃতের সংগে যথেষ্ট সাদৃশ্য রক্ষা ক'রে বিদ্যমান। এই দুই ভাষার মধ্যে বর্তমান ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের তুলনাকে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত করা যায়।

(১) গ্রীকের স্বরধ্বনিসমূহ মূলভাষার সংগে অধিক সংগতিপূর্ণ এবং এর সন্ধ্যক্ষর (dipthongs) গুলি সংখ্যায় বেশী। সংস্কৃতে মূলভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ অধিক অবিকৃত।

(২) উভয় ভাষারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের স্বরসঞ্চার বা সুরমাত্রা (musical accent)।

(৩) উভয় ভাষাতেই দ্বিবচন সংরক্ষিত হ'য়েছে।

(৪) মূলভাষার অনুনাসিক অর্ধব্যঞ্জন (sonant nasal) ম্, ন্ (m̥, n̥) উভয় ভাষাতেই 'অ' (a)-তে পরিণত।

(৫) উপসর্গ এবং ক্রিয়াবিশেষণের প্রাচুর্য উভয় ভাষারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

(৬) নামপদ এবং সর্বনামের (nouns & pronouns) শব্দরূপ

গঠনের বিষয়ে সংস্কৃতের বৈচিত্র্য অনেক বেশী। গ্রীকে করণ এবং অধিকরণ ইত্যাদি স্বল্প কয়েকটি কারক-বিভক্তি পাওয়া যায়।

(৭) ধাতুরূপাদর্শের ক্ষেত্রে উভয় ভাষারই বিপুল বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। সাধারণ কাল ও ভাববোধক রূপ ছাড়াও প্রেরণার্থক (causative), ইচ্ছার্থক (desiderative), পৌনঃপুনিক (intensive) প্রভৃতি রূপায়িত (derived) ধাতুরূপাদর্শ প্রচুরভাবে দেখা যায়। এছাড়া আছে অসমাপিকা ও ঘটমান কৃদন্তের (infinitives and gerunds) বিপুল বৈচিত্র্য। সংস্কৃতের আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ যথাক্রমে গ্রীক ভাষার middle ও active-voice-এর সংগে তুলনীয়। কর্মকর্তৃবাচ্যে র্-উপাদান উভয় ভাষাতেই দৃষ্ট। ধাতুরূপ গঠনে আগম-প্রত্যয় (augment)-এর ব্যবহারও উভয় সাধারণ লক্ষণ।

(৮) গ্রীক ও সংস্কৃত উভয়ত্রই একাধিকপদ সমন্বিত সমাস গঠনের রীতি আছে। তবে গ্রীকের সমাসবদ্ধ পদ কখনই সংস্কৃতের সমস্ত পদের দৈর্ঘ্য লাভ করেনি।

Ref. Taraporewalla — Elements of the Science of Language.
প. মজুমদার — সং. ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ
Thumb — Das Handbuch des Sanskrit
T. Burrow — The Sanskrit Language.

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতীয় লিপি

সাধারণ পাশ্চাত্য অভিমত, ভারতীয় আর্যদের মধ্যে লিপির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করে। আর্যদের আগমনের (T. Burrow-র মতে অভিযানের—invasion) পূর্বে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে হয়ত' কোন প্রকার লিপির ব্যবহার ভারতে প্রচলিত ছিল; কিন্তু আর্য-সভ্যতার প্রভাবে নাকি তা' লুপ্ত হ'য়ে যায়। বলা হ'য়েছে, বৈদিক সংস্কৃতির ইতিহাসে যখন লিখন পদ্ধতির অভ্যাস বা প্রচলন শুরু হয়, তখনও এবং তার পূর্বে বৈদিক সাহিত্যের পঠন-পাঠন-সংরক্ষণ সম্ভব হ'য়েছিল শ্রুতি এবং মৌখিক আবৃত্তির মাধ্যমে। লিখনপদ্ধতি প্রচলিত হ'বার পরেও এমন কি এখনও ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই মৌখিক আবৃত্তি।

ভারতীয় বর্ণমালা কোন্ সময়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তা এখনও জানা যায় না। সংস্কৃত ভাষার দেবনাগরী বর্ণমালার উদ্ভবস্থল ভারতবর্ষই, অথবা তারা বিদেশী কোন বর্ণমালা হ'তে উদ্ভূত এ নিয়েও বহু বিতর্ক র'য়েছে। অধ্যাপক ব্যুহ্লার (Bühler)-এর মতে বিদেশী উৎস হ'তে উদ্ভূত হ'লেও এদেশীয় ভঙ্গীতে এই বর্ণগুলি এমন বিবর্তিত হ'য়েছে যে তাদের ভিন্নতা সম্পর্কে কারও সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। জেনেরাল কানিংহাম, অধ্যাপক ডোসন প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা ভারতীয় লিপি-

মালার দেশজ উৎসকেই সমর্থন জানিয়েছেন, কিন্তু এই অভিমত বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করতে পারেনি। সার্ উইলিয়াম জোন্স্ (১৮০৬) এবং কপ্ (Kopp, ১৮২১) সেমিটিক্ উৎস-সন্ধানে তৎপর ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লেপসিউস্ (Lepsius) এবং বেবার (Weber) এর সপক্ষে যুক্তি ও সমর্থন প্রকাশ করেন। ব্যূহ্লার, ম্যাক্স্ ম্যূলর, ফ্রিড্রিখ্ ম্যূলর, স্যাস্ (Sayce), হুইট্নি প্রভৃতিও মোটামুটীভাবে এই বক্তব্যকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ল্যাসেন ও এড্ওয়ার্ড টমাস্ সেমিটিক উৎসকে প্রত্যাখ্যান ক'রে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় উৎসকে সমর্থন করেন।

এই বিতর্কের মধ্যে বিভ্রান্ত না হ'য়ে কয়েকটি বিশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সহজতর। ভারতীয় বর্ণমালা 'ব্রাহ্মী', 'মাতৃকা', 'দেবনাগরী' প্রভৃতি নামে অভিহিত হ'ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভাল সংস্কৃতের পরিচিততম দেবনাগরী হরফ্, তথা ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রচলিত সব কটি লিপিমালারই উৎস ব্রাহ্মী লিপি। সেই ব্রাহ্মী লিপির বিদেশী উৎস-সন্ধান না ক'রে তার ভারতীয় স্বরূপতার পক্ষে যুক্তিগুলির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণেরই অনেকগুলি নাম ছিল, প্রত্যেকটিই কোন না কোন দেবদেবীর বাচক। প্রকৃতপক্ষে দেবতার মূর্তিকে পূজা করার মত সেকালে দেবতার প্রতীকস্বরূপ বর্ণসমূহও পূজিত হ'ত। এবং সনাতন ধর্মীয়রা তাঁদের শ্রেষ্ঠ দেবীকে মাতা মনে ক'রতেন ব'লে অক্ষরের নাম দিয়েছিলেন 'মাতৃকা' অর্থাৎ 'মাতার চিত্র'; 'ক'-প্রত্যয়ের অর্থ চিত্র, যেমন রামক=রামের চিত্র, লক্ষ্মণক =লক্ষ্মণের চিত্র ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে এই তাৎপর্যবোধ গেল

লুপ্ত হ'য়ে ; ফলে অক্ষরের বিশিষ্ট নামগুলি কেবলমাত্র সেই বর্ণ-বোধক ব'লেই মনে হ'ল। ভারতীয় বর্ণমালার 'দেবনাগরী' নাম-করণের একটি তাৎপর্যবাহী বর্ণনা অতি চমৎকার। তৈত্তিরীয় উপনিষদে একস্থানে বিভিন্ন দেবতার বোধক কতকগুলি বৃত্তাকার চিহ্ন প্রদর্শিত হ'য়েছে, এবং ঐ বৃত্তগুলিকে সমষ্টিগতভাবে বলা হ'য়েছে "দেবানাং নগরম্" অর্থাৎ কিনা 'দেবতাদের বাসযোগ্য নগর'। সুতরাং ভারতীয় বর্ণমালার (যেগুলি মূলতঃ বিভিন্ন দেববাচী ছিল) নাম 'দেবনাগরী' হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ; 'দেবনাগরী' অর্থাৎ দেবতাদের নগর হ'তে আগত।

অতএব ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে পশ্চিম ভারতের সংগে উত্তর সেমিটিক অথবা দক্ষিণ-সেমিটিক দেশগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তাদের বর্ণমালা থেকেই ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি অনুকৃত হয় এই ধারণাকে আঁকড়ে থাকার পক্ষে যথার্থ যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। ভারতীয় সনাতন মতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মাই ধ্বনির ব্যঞ্জনাময় ও দেবতার প্রতীকস্বরূপ বর্ণসমূহকে সৃষ্টি করেন। তারা 'অক্ষর' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বা তদ্বোধক। তারা ব্রাহ্মী, ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট বা তদ্বাচী।

এই গেল ভারতীয় লিপির উৎস-সম্পর্কিত বিচার। ভারতীয় লিপিমালা কোন্ সময় হ'তে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হ'তে শুরু করে তা আজও ভাল ক'রে নির্ণয় করা যায় না। ডক্টর ব্যুহ্লার ব'লেছেন বশিষ্ঠের ধর্মসূত্রে ভারতীয় লিপিসম্পর্কে প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। এই ধর্মসূত্রের সময়সীমা আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতক। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে 'লিপিকর' ও 'লিবিকর' এই

ত্ব'টি শব্দের সমাসগত ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণ দেখা যায়। অধ্যাপক গোল্ড্ষ্ট্যুকার্-এর মতে পাণিনি খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন, অন্য কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন পাণিনি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের মানুষ ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতে সর্বপ্রথম অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে লিখন বিষয়ক বহু শব্দের উল্লেখ দেখা যায়—মহাভারতে 'লিখ', 'লেখ', 'লেখক', 'লেখন' প্রভৃতি শব্দ উল্লিখিত হ'য়েছে; কিন্তু কোন স্থানেই 'লিপি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, লিপি শব্দটি বিদেশী, সেমিটিক 'দিপি' শব্দ হ'তে উদ্ভূত, সেই কারণেই তার উল্লেখ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যাই হোক ঐ সম্পর্কে সুধীসমাজ সাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রামায়ণ মহাভারতের যুগে ভারতে লিখন প্রক্রিয়া অজ্ঞাত ছিল না। ত্বটি তথ্য এই বিষয়কে সপ্রমাণ করে। প্রথমতঃ, সর্বত্র বলা হয় ভারতীয় আর্যগণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁদের সমাজে ব্যবসায়িক চুক্তিপত্রাদি অর্থনৈতিক সম্পর্কের নিরূপণ, লিখ্য-প্রমাণ প্রভৃতি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। বেদের সংহিতা ভাগে পর্যন্ত 'অক্ষর', কাণ্ড', 'গ্রন্থ', 'পটল' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। লিখন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হ'লে এই ধরনের সামাজিক বিনিময়-ব্যবহার এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সংক্রান্ত কার্যকলাপ কি সম্ভব হ'ত? দ্বিতীয়তঃ, সিংহলী 'তিপিটক' গ্রন্থের বহু অংশে ভারতবর্ষের লিখনপদ্ধতির নিয়মিত অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে 'লেখ' এবং 'লেখক' শব্দের উল্লেখ আছে। জাতকমালায় বর্ণমালা সম্পর্কে প্রায়ই নানা বিষয় আলোচিত

হ'য়েছে। এ ছাড়াও বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ একটি ক্রীড়া ছিল, তার নাম 'অক্ষরিকা', অর্থাৎ অক্ষর বিষয়ে অনুমান করার খেলা। আরও শোনা যায়, 'বিনয়' গ্রন্থমালায় বলা ছিল, রাজার নথিপত্রে অপরাধীদের তালিকায় যার নাম লিখিত থাকবে, তেমন মানুষকে বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘে স্থান দেওয়া হবে না। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসঙ্গত নয়, যে বৌদ্ধ-যুগে ভারতে লেখার প্রচলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ভারতীয় লিপির প্রচলন সম্পর্কে একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্য গ্রন্থে (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) লেখন পদ্ধতি বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে উচ্চারিত শব্দাবলীরই বিশ্লেষণ দেখা যায়, লিখিত পাঠ্যাংশ সম্বন্ধে কোন বিচার প্রায় নেই।

ভারতীয় লিপির ইতিহাস অনুসন্ধানের পক্ষে প্রাচীন লেখ-মালাসমূহ (inscriptions) প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়। কলোনেল্ ক্লাক্স্টন পেপে কর্তৃক আবিষ্কৃত, আনুমানিক খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে লিখিত পিপরাওয়া পাত্রলিপি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। এ'টি ব্রাহ্মীহরফে লিখিত। অপর একটি নিদর্শন খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের সোহগৌরা তাম্রলিপি। মহারাজ অশোকের শিলালিপি সমূহ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী দুই প্রকার হরফেই লিখিত। উল্লেখযোগ্য শাহবাজগড়ী এবং মানসেহ্‌রা লেখ দুটি খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। অশোকের লেখ সমূহের ভাষা ছিল প্রধানতঃ প্রাকৃত ও তার বিভাষা সমূহ। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উল্লেখযোগ্য লেখ হ'ল নাসিক গুহায় আবিষ্কৃত মহারাজ নহপানের প্রত্নলেখ। এর সময়সীমা খুব

সম্ভবতঃ ১১৯ খ্রীষ্টাব্দ। অপর বিখ্যাত সংস্কৃত-লেখ মহারাজ রুদ্রদামনের জুনাগড়-লেখ (১৫০ খ্রীঃ)।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ভারতে ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী এই দুই প্রকার লিপিমালা প্রচলিত ছিল। ডক্টর বূ্হ্‌লার-এর মতে খরোষ্ঠী লিপির মূল প্রকৃতি ফি্‌নীসীয় চরিত্রের। হ্‌খমেনীয় রাজাদের প্রভাবাধীনে থাকাকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসীক করণিকদের অনুকরণে ভারতীয়েরা এই লিপি অভ্যাস করে। এই লিপি মধ্য এশিয়া ও ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রত্যন্তদেশে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আবার বলেন খরোষ্ঠী লিপির অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর বর্ণগুলি গর্দভের (=খর) ওষ্ঠ সদৃশ ব'লেই তার এই নামকরণ হ'য়েছে। অধ্যাপক লেভির মতে মধ্য এশিয়ার 'খরোষ্ঠ' নামক কোন জাতির নামানুসারে এই নাম প্রদত্ত। যাই হোক, লক্ষ্যণীয় বিষয় এইমাত্র যে, পারসীকের মত 'খরোষ্ঠী' লিপি ডান হ'তে বামে (Right to Left) লিখিতে হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মী লিপি বাম হ'তে দক্ষিণে লিখিত। এই লিপির উদ্ভব সম্পর্কিত বিচার আগেই দিয়েছি। এই লিপিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংগে কেবল স্বরবর্ণের যুক্তরূপতা সম্পাদিত হ'য়েছে, তাই নয়; বিভিন্ন ব্যঞ্জনের যুগ্মরূপতাও স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত। ভারতের অধিকাংশ স্থানেই এই লিপি গৃহীত হয়, ফলে তার মধ্যে প্রাদেশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংসাধিত হ'তে থাকে। সংস্কৃতের সর্বাধিক প্রচলিত দেবনাগরীরও উৎস এই ব্রাহ্মী বর্ণমালা। ভারতের প্রাদেশিক বর্ণ ও লিপিমালা সমূহও ব্রাহ্মীলিপি হ'তে উদ্ভূত, যদিও

হ'য়েছে। এ ছাড়াও বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ একটি ক্রীড়া ছিল, তার নাম 'অক্ষরিকা', অর্থাৎ অক্ষর বিষয়ে অনুমান করার খেলা। আরও শোনা যায়, 'বিনয়' গ্রন্থমালায় বলা ছিল, রাজার নথিপত্রে অপরাধীদের তালিকায় যার নাম লিখিত থাকবে, তেমন মানুষকে বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘে স্থান দেওয়া হবে না। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসঙ্গত নয়, যে বৌদ্ধ-যুগে ভারতে লেখার প্রচলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ভারতীয় লিপির প্রচলন সম্পর্কে একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্য গ্রন্থে (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) লেখন পদ্ধতি বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে উচ্চারিত শব্দাবলীরই বিশ্লেষণ দেখা যায়, লিখিত পাঠ্যাংশ সম্বন্ধে কোন বিচার প্রায় নেই।

ভারতীয় লিপির ইতিহাস অনুসন্ধানের পক্ষে প্রাচীন লেখ-মালাসমূহ (inscriptions) প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়। কলোনেল্ ক্লাক্স্টন পেপে কর্তৃক আবিষ্কৃত, আনুমানিক খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে লিখিত পিপরাওয়া পাত্রলিপি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। এ'টি ব্রাহ্মীহরফে লিখিত। অপর একটি নিদর্শন খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের সোহগৌরা তাম্রলিপি। মহারাজ অশোকের শিলালিপি সমূহ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী দুই প্রকার হরফেই লিখিত। উল্লেখযোগ্য শাহবাজগড়ী এবং মানসেহ্‌রা লেখ দুটি খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। অশোকের লেখ সমূহের ভাষা ছিল প্রধানতঃ প্রাকৃত ও তার বিভাষা সমূহ। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উল্লেখযোগ্য লেখ হ'ল নাসিক গুহায় আবিষ্কৃত মহারাজ নহপানের প্রত্নলেখ। এর সময়সীমা খুব

সম্ভবতঃ ১১৯ খ্রীষ্টাব্দ। অপর বিখ্যাত সংস্কৃত-লেখ মহারাজ রুদ্রদামনের জুনাগড়-লেখ (১৫০ খ্রীঃ)।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ভারতে ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী এই দুই প্রকার লিপিমালা প্রচলিত ছিল। ডক্টর বূহ্‌লার-এর মতে খরোষ্ঠী লিপির মূল প্রকৃতি ফি্‌নীসীয় চরিত্রের। হ্‌খমেনীয় রাজাদের প্রভাবাধীনে থাকাকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসীক করণিকদের অনুকরণে ভারতীয়েরা এই লিপি অভ্যাস করে। এই লিপি মধ্য এশিয়া ও ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রত্যন্তদেশে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আবার বলেন খরোষ্ঠী লিপির অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর বর্ণগুলি গর্দভের (=খর) ওষ্ঠ সদৃশ ব'লেই তার এই নামকরণ হ'য়েছে। অধ্যাপক লেভির মতে মধ্য এশিয়ার 'খরোষ্ঠ' নামক কোন জাতির নামানুসারে এই নাম প্রদত্ত। যাই হোক, লক্ষ্যণীয় বিষয় এইমাত্র যে, পারসীকের মত 'খরোষ্ঠী' লিপি ডান হ'তে বামে (Right to Left) লিখিতে হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মী লিপি বাম হ'তে দক্ষিণে লিখিত। এই লিপির উদ্ভব সম্পর্কিত বিচার আগেই দিয়েছি। এই লিপিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংগে কেবল স্বরবর্ণের যুক্তরূপতা সম্পাদিত হ'য়েছে, তাই নয়; বিভিন্ন ব্যঞ্জনের যুগ্মরূপতাও স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত। ভারতের অধিকাংশ স্থানেই এই লিপি গৃহীত হয়, ফলে তার মধ্যে প্রাদেশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংসাধিত হ'তে থাকে। সংস্কৃতের সর্বাধিক প্রচলিত দেবনাগরীরও উৎস এই ব্রাহ্মী বর্ণমালা। ভারতের প্রাদেশিক বর্ণ ও লিপিমালা সমূহও ব্রাহ্মীলিপি হ'তে উদ্ভূত, যদিও

তারা মূল হ'তে এত বেশী বিবর্তিত হয়ে গেছে যে বর্তমানে তাদের মূল প্রকৃতি নির্ণয় করা রীতিমত গবেষণা-সাপেক্ষ। ফলে একই লিপি হ'তে কাশ্মীরী, বাংলা, ওড়িয়া, তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষায় 'শারদা' এবং তামিল ভাষায় 'গ্রন্থ' উৎপন্ন।

লেখার উপকরণ হিসেবে তালীপত্রই সর্বাধিক ব্যবহৃত হ'ত। দক্ষিণ ভারতে এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে। উত্তর ভারতে বিশেষ ক'রে কাশ্মীরে ভূজগাছের (Birch tree) ভেতরের বাকলটি এই কাজের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। ভূর্জপত্রের লেখা পুঁথি উত্তর ভারতেই বেশী পাওয়া গেছে। তালপাতায় লিখতে হ'লে একটি লেখনীর সাহায্যে আগে অক্ষরগুলির আঁচড় কেটে নিয়ে পরে তাদের মসীলিপ্ত করা হ'ত। ভূর্জপত্রে কিন্তু প্রথমেই কালিদিয়ে অক্ষর সন্নিবেশ করা যেত। এই মসী লেপন থেকেই, লিপি' শব্দটি উদ্ভূত। এমন অভিমত অনেক প্রাচ্যপণ্ডিত পোষণ করেন। তাঁরা √লিপ্ ধাতু, (অর্থ লেপন করা) থেকে এর ব্যুৎপত্তি স্বীকার ক'রে শব্দটির সেমিটিক উৎস অস্বীকার ক'রেছেন। যাই হোক তালীপত্র বা ভূর্জপত্র দুটিই অত্যন্ত সহজে নষ্ট হ'য়ে যায় ব'লেই প্রাচীন ভারতীয় আর্য সাহিত্যের অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক নিদর্শনই আমাদের সময় পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষিত হ'য়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের যে সম্ভার আমরা দেখি তা গত কয়েক শতকে লিখিত। তার পূর্বেকার সাহিত্যসম্পদের অতি স্বল্প অংশই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হ'য়েছে।

সংক্ষেপে এই হ'ল ভারতীয় লিপির বিবর্তন ও প্রকৃতির সামান্য বিবরণ। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সংস্কৃতির লিপি ও মুদ্রাঙ্ক সমূহের

পরিচয় আবিষ্কার না করা পর্যন্ত ভারতীয় লিপির সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের এক বিরাট অংশই অজ্ঞাত থাকে। ঐ বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হ'লে এবিষয়ে আরও অভিনব এবং যুক্তি-গ্রাহ্য বিবৃতি পরিবেশন করা সম্ভব হবে।

Ref. T. Burrow. The Sans. Language.
G. Shastri. History of Classical Sans. Literature.
R. Shamshasti The Origin of the Devnāgrī Alphabet.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাষার শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর ভাষাসমূহের গোত্রবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগ দু'ভাবে করা যেতে পারে—(১) বংশগত (geneological) এবং (২) গঠন বা পদক্রমগত (morphological/syntactical)। ভাষার বংশগত বিভাগ অনুসারে পৃথিবীতে ব্যবহৃত মুখ্য ভাষাগুলি ১৩টি (মতান্তরে ১২টি) প্রধান ভাষা-পরিবারে বিভক্ত হ'তে পারে। যথা (১) রেড ইণ্ডিয়ান্, (২) সেমিটিক—অর্থাৎ হিব্রু, আসিরীয়, সিরীয় এবং আরবীয়, (৩) হামীয়—অর্থাৎ প্রাচীন মিশরীয়, লিবীয় ইত্যাদি, (৪) দক্ষিণ-পূর্ব-এশীয়—চীনা, তিব্বতী, বর্ম্মী, শ্যামদেশীয়, (৫) উরাল প্রদেশীয়—জাপানী, ফিনিশ প্রভৃতি, (৬) ইন্দো-ইউরোপীয়—তার দশটি শাখা সহ, (৭) দ্রাবিড়—তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়লম্, (৮) মালয়দেশীয়—পলিনেশীয়, (৯) অষ্ট্রেলীয়—পাপ্পুয়ান্, (১০) পশ্চিম আফ্রিকার বাস্ক্, (১১) ককেশীয়, (১২) মার্কিণ ভারতীয় ভাষাসমূহ, (১৩) মধ্য আফ্রিকার ভাষাসমূহ।

এছাড়াও আরো ১২/১৩টি গৌণ ভাষা-পরিবার আছে।

রূপতত্ত্বগত বিভাগ পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীতে ব্যবহৃত ভাষা-সমূহকে চারটি পরিবারে (families) বিভক্ত করা যায়। (১) অসম-বায়ী (Root or Isolating), (২) যৌগিক (Agglutinative) (৩) যৌগিক-সমবায়ী (Agglutinative Inflectional), (৪) সমবায়ী

(Inflectional)। কেউ কেউ প্রথমে দুটি বিভাগ—সমবায়ী (Inflectional) ও অসমবায়ী (Isolating) স্বীকার করেন। 'সমবায়ী' গোষ্ঠীকে আবার যৌগিক, যৌগিক-সমবায়ী এবং সম্পূর্ণ-সমবায়ী এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন।

যাই হোক, প্রত্যেকটি গোত্রের বিষয়ে সামান্য ভাষাবৈশিষ্ট্যগত পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) অসমবায়ী—এই জাতীয় ভাষাতে কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ পদরূপ নেই। চীনাভাষা এই বিভাগের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। এই জাতীয় ভাষাতে বাক্যে অবস্থান-অনুসারে একটি শব্দের পরিচয় নির্ণীত হয়। ফলে, একটি শব্দ ক্রিয়া, বিশেষ্য অথবা বিশেষণ—সবই হ'তে পারে; কারণ, এই পদসমূহের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবার ফলে তার ঐ পরিচয় হয় না, বাক্যে সংস্থান-অনুসারে একই পদের বিভিন্ন পরিচয় প্রকাশিত। বাক্যে অবস্থান এবং বক্তার বাচনভঙ্গী (tone) অনুসারে বাক্যের অর্থও নির্ণীত হয়। বর্ম্মী ভাষাও এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। একে অসমবায়ী (Root) ভাষা নাম দেওয়া হ'য়েছে। কারণ, এই গোষ্ঠীর ভাষা সমূহে বিভক্তি বা প্রত্যয়যোগে প্রকৃতি বা মূল শব্দ ও ধাতুর অর্থ বিশেষিত করা হয় না। সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক শব্দগুলি বা ধাতুগুলি ভাব-অনুসারে বিভিন্ন সংস্থান লাভ করে। অন্যান্য ভাষাতে প্রকৃতি বা ধাতুমূল (roots) রূপে চিহ্নিত শব্দগুলি এখানে এক একটি পদরূপে ব্যবহৃত।

(২) যৌগিক—পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাই যৌগিক ভাষার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এই ভাষাকে ইংরাজীতে Agglutinative নামে অভিহিত করা হয়। লাতিন ভাষায় 'gluten' শব্দের অর্থ চূণ বা

রঙ্‌ ; অর্থাৎ এই ভাষায় শব্দমূল বা ধাতুমূলের সংগে বিভক্তি এবং প্রত্যয়গুলি পর পর সাজিয়ে মিশ্রিত একটি পদ সাধন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতি এবং প্রত্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদান সমূহকে সহজেই চেনা যায় এবং তাদের সম্পর্ক ও অর্থ অনুধাবন করতেও কোন অসুবিধা হয় না। এই ভাষার বাক্য রচনা ও পদ গঠনের মধ্যে এমন বিশিষ্ট যৌগিক পদ্ধতি অনুসৃত হ'লেও বাক্যস্থ প্রতি পদকে পরস্পর যুক্ত ক'রে একশব্দাত্মক একটি বাক্য রচনা করা হয় না। যৌগিক অর্থ শব্দের বা পদের উপাদানগুলিকে পরপর একটির সংগে অপরটি সংযুক্ত করা হয় ; তাতে ধ্বনি পরিবর্তন হ'তেও পারে, নাও পারে। একবচন ও বহুবচনের বিভক্তির কোন তফাৎ নেই, কারণ, শব্দ ও বিভক্তির মাঝে অন্য একটি উপাদান তাদের বচন নির্ণয়ে সহায়ক। এই ভাবে একটি শব্দের সংগে একের পর এক বিভিন্ন অর্থবোধক উপাদানের সমন্বয়ে বিভিন্ন পদ গঠন করার সামর্থ্য এই ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তুর্কী ভাষায় 'এভ্‌' (ev) শব্দের অর্থ 'গৃহ'। শব্দটির রূপগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	এভ্‌ (ev)	এভ্‌লের্‌ (ev-ler)
দ্বিতীয়া	এভ্‌-ই (ev-i)	এভ্‌লের্‌-ই (ev-ler-i)
চতুর্থী	এভ্‌-এ (ev-e)	এভ্‌-লের্‌-এ (ev-ler-e)
পঞ্চমী	এভ্‌-দেন্‌ (ev-den)	এভ্‌-লের্‌-দেন্‌ (ev-ler-den)
ষষ্ঠী	এভ্‌-ইন্‌ (ev-in)	এভ্‌-লের্‌-ইন্‌ (ev-ler-in)
সপ্তমী	এভ্‌-দে (ev-de)	এভ্‌-লের্‌-দে (ev-ler-de)

এখানে -লের্—উপাদানটি বহুবচন বোধক। এইরকম—

√সেভ্-মেক্ = ভালবাসা ; √সেভ্-মে-মেক্ = ভালো না বাসা ; √সেভ্-ইন্-মেক্=(পরস্পর) আনন্দ করা (to rejoice); √সেভ্-ইল্-মেক্=কারও ভালবাসা পাওয়া (কর্মবাচ্য/to be loved); সেভ্-ইশ্-মেক্=পরস্পরকে ভালবাসা ইত্যাদি। এবং, 'ক্যত্' (Kat)=বিড়াল, 'ইন্'=স্ত্রীলিঙ্গ, 'ইদ্'=সন্তান, 'এত্'=ছোট, 'ও' =দ্রব্যবাচী : সুতরাং ক্যত্-ইন্-এত্-ইদ্-ও=একটি ছোট স্ত্রী-বিড়ালের বাচ্চা।[1]

কোন কোন বিশেষজ্ঞ যৌগিক ভাষাকে উপসর্গ-যৌগিক, (prefix-agglutinating), অনুসর্গ বা প্রত্যয় যৌগিক (suffix-agglutinating), উপসর্গ-অনুসর্গ-যৌগিক, (prefix-suffix-agglutinating) এবং আংশিক-যৌগিক (partially agglutinating) এই চার ভাগে বিভক্ত করেন।

তুর্কী, হাঙ্গেরীয়, ফিনিশ্, পলিনেশীয় প্রভৃতি ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) যৌগিক-সমবায়ী—এই গোত্রের ভাষাসমূহে ধাতুমূল এবং শব্দের সংগে প্রত্যয় এবং প্রাত্যয়িক উপাদান যোগ ক'রে পদ গঠিত হয়। এই জাতীয় ভাষায় প্রত্যয় যোগ হবার পূর্বেই ধাতুর বর্ণ সমূহের মধ্যে আন্তর (internal) প্রাত্যয়িক পরিবর্তন (inflexional changes) দেখা যায়। এই ভাষার ধাতুগুলি সাধারণতঃ তিনটি ব্যঞ্জন বিশিষ্ট হয় ; তার মধ্যে স্বরাগম ঘটিয়ে পদ গঠন ও বাক্যে

---

[1] Taraporewalla. Elements of the Science of Language.

তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়। সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সেখানে মৌলিক উপাদান এবং স্বরবর্ণগুলি ব্যাকরণ ও বাক্যরীতিগত উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, একই ধাতু √ক্যত্‌ল্ (qtl) এবং √স্‌ল্‌ম্ হ'তে উৎপন্ন একাধিক ভিন্নার্থক শব্দের উল্লেখ করা যায়।[২] যথা—

√ক্যত্‌ল্ (qtl) > ক্যতল = সে হত্যা ক'রেছিল,
> ক্যুতিল = সে নিহত হ'য়েছিল,
> যক্‌তুলু = সে হত্যা করে,
> ক্যাতিল্ = হত্যা, > ক্যিত্‌ল্=শত্রু ইত্যাদি।

√স্‌ল্‌ম্ (slm) > সেলিমা, সালাম্, ইস্‌লাম্, মুস্‌লিম্, সেলিম্, সুলেমান্ প্রভৃতি।

সেমিটিক্ ও তিব্বতী ভাষা সমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) সমবায়ী বা প্রাত্যয়িক গোত্র—এই জাতীয় ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে বাক্যে একটি পদের পরিচয় তথা পদসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে শব্দগুলির সংগে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়ের উপর। এই প্রত্যয়গুলির স্বাধীন এবং অন্যনিরপেক্ষ কোন অর্থ এবং ব্যবহার সম্ভবতঃ কোন দিনই ছিল না। যৌগিক-সমবায়ীর মত এই গোত্রে প্রত্যয় সমূহ আগেই ধাতুমূলের কোন প্রাত্যয়িক পরিবর্তন সাধিত করে না; প্রত্যয় যুক্ত হবার পরে নূতন শব্দটি একটি অখণ্ড পদরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার মধ্যে প্রত্যয়জাত ও ধ্বনিগত পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে। এমনও হ'তে পারে বহুপূর্বে

---

[২] **Taraporewalla. Elements of the Science of Language.**

এই শব্দগুলি একক সমন্বয়ী শব্দরূপেই ব্যবহৃত হ'ত ; পরবর্তী কালে ক্রমশঃ তাকে বিশ্লেষণ ক'রে তাদের প্রাত্যয়িক স্বরূপ নিরুক্ত হ'য়েছে। এই গোষ্ঠীতে ধাতুগুলি অধিকাংশ একস্বর বিশিষ্ট এবং প্রত্যয়গুলিও একাক্ষর (monosyllabic) বিশিষ্ট বর্ণগুচ্ছ, অখণ্ড পদ গঠনের পরে অনেক সময় যাদের হয়ত' একটি মাত্র বর্ণ অবশিষ্ট থাকে। যৌগিক ভাষাতে প্রকৃতি ও বিভক্তি বা প্রত্যয়ের মাঝে আগত উপাদানগুলি অর্থ-নিরূপণের মাপকাঠি, কিন্তু শুদ্ধ সমবায়ী ভাষাতে প্রত্যয়গুলিই সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে। অধিকন্তু, ধাতুর সংগে ব্যবহৃত প্রত্যয় (কৃত্), শব্দের সংগে ব্যবহৃত প্রত্যয় (তদ্ধিত), ধাতুরূপ গঠনের বিভক্তি (তিঙ্), শব্দরূপ গঠনের উপাদান (সুপ্-বিভক্তি), উপসর্গ, একাধিক পদের দ্বারা সমাস গঠনের সামর্থ্য, এবং শব্দ ও ধাতুর স্বরক্রম বা শ্রুতি (vowel gradation/ablaut) এই ভাষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। প্রত্যয়-নির্ভর অর্থ-পরিবর্তনের উদাহরণ—

সংস্কৃতে—ভবামি = আমি হই, ভবতি = সে হয়।
ভবামঃ = আমরা হই, ভবন্তি = তা'রা হয়।

আধুনিক পারসীকে—অম্যদম্ = আমি এসেছিলাম
অম্যদীদ্ = তুমি এসেছিলে
অম্যদ্ = সে এসেছিল
অম্যদন্ = আমরা এসেছিলাম
অম্যদী = তোমরা এসেছিলে
অম্যদন্দ্ = তা'রা এসেছিল।

ফরাসীতে— je parle = আমি বলি .
tu parles = তুমি বল
nous parlons = আমরা বলি
vouz parlez = তোমরা বল
ils parlent = তা'রা বলে

আধুনিক জার্মান্-ভাষায়—ich gehe = আমি যাই
du gehst = তুমি যাও
er geht = সে যায়
Sie gehen = আপনি যান

তুর্কী ভাষায় 'হল্' (hall) = মাছ। 'উঙ্ক্' (unk) উপাদান বোঝায় 'আমার'। সুতরাং 'হলুঙ্ক্' = আমার মাছ।

তুলনীয় ফার্সী-ভাষায় 'পেদর্' = পিতা। 'পেদরম্' = আমার পিতা, 'পেদরন্' = তাদের পিতা ইত্যাদি। সংস্কৃতে 'অহম্' = আমি, 'মদীয়' = আমার, 'অস্মদীয়' = আমাদের।

ইন্দো-ইউরোপীয় তবং দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ এই গোত্রের অন্তর্গত।

যৌগিক-সমবায়ী ও শুদ্ধ সমবায়ী বা প্রাত্যয়িক ভাষার মধ্যে পার্থক্য—অনেকে এই দুটি গোত্রকে একটি গোত্রেরই দুটি উপবিভাগ-রূপে কল্পনা করে থাকেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সীমা-রেখা যথেষ্ট স্পষ্ট। শুদ্ধ-সমবায়ী ভাষার স্বরক্রম বা অপশ্রুতি (vowel gradation/ablaut) যৌগিক সমবায়ী সেমিটিক ভাষাগুলিতে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। শুদ্ধ-সমবায়ী ভাষায় প্রত্যয় ও প্রাত্যয়িক পরিবর্তনের বহুল প্রভাব শব্দ ও ধাতুমূল উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে, কিন্তু

যৌগিক সমবায়ী ভাষাতে ধাতুর আন্তর প্রাত্যয়িক পরিবর্তনই প্রধান। যৌগিক সমবায়ী ভাষায় ধাতুগুলি স্বরবর্ণবিহীন তিন-ব্যঞ্জন বিশিষ্ট হয়, কিন্তু শুদ্ধ প্রাত্যয়িক ভাষায় ধাতুগুলি সাধারণতঃ একস্বর বিশিষ্ট হয়। সুতরাং শুদ্ধ সমবায়ী ভাষাতে প্রত্যয় ধাতুর পরে যুক্ত হয়, কিন্তু যৌগিক-সমবায়ী ভাষায় প্রত্যয় ধাতুর ব্যঞ্জনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তার অর্থ পরিবর্তন সাধন করে। যৌগিক-সমবায়ী ভাষা যৌগিক ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং সমবায়ী ভাষার গঠন প্রণালীতে বিন্যস্ত; সেই কারণেই এই নামকরণের সার্থকতা র'য়েছে।

ভাষার রূপতত্ত্ব বা গঠনগত বিভাগের পর্যালোচনা এখানেই সমাপ্ত করা যায়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষার বিশদ নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই গোত্রবিভাগের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দিগ্‌দর্শন কখনই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এইটুকু বলা যায়, বংশগত বিভাগের চেয়ে ভাষার গঠনগত বিভাগ ভাষাতত্ত্বের উদ্দেশ্যের নিরিখে অনেক বেশী উপযোগী ও কার্যকরী ব'লেই পণ্ডিতবর্গ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

Ref. **P. D. Gune** — **An Introduction to Comp. Philology.**
Taraporewalla — **Elements of the Science of Language**
Max Müller — **The Science of Language**

চতুর্দশ অধ্যায়

ধ্বনিসূত্র ও ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষাই সদা বিবর্তিত হ'চ্ছে। ফলে তার মধ্যে ধ্বনি ও রূপগত পরিবর্তন নিত্যই সংঘটিত হ'চ্ছে। Dr. P. D. Gune-র ভাষায় "If we follow the course of the life of any language, we clearly see,...that no language is ever in a static condition; that it always changes and grows."[1] তিনি আরও ব'লেছেন, "The very fact of the acquisition of language presupposes change; for no generation can take up a language from its predecessors in exactly the same outward form."[2] অর্থাৎ ভাষা যেহেতু সম্প্রদায়ক্রমে এবং বংশপরম্পরায় গৃহীত হয়, মানুষের অনুকরণের ত্রুটি তাতে থাকতে বাধ্য এবং তার শব্দগঠনে, ধ্বনির উচ্চারণে ও বাক্যে পদবিন্যাসে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ভাষার উভয়বিধ পরিবর্তনের পক্ষেই অনুকৃতি বা পুনরাবৃত্তি প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণ হ'ল 'সাদৃশ্য' বা analogy। প্রথমটি ব্যক্তির শারীরবিজ্ঞানের প্রতি নির্ভরশীল, দ্বিতীয়টি মানসিক গঠনের প্রতি।

ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের একটি নিয়মিত ধারাকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে সূত্রাকারে উপস্থিত করাই ধ্বনিসূত্র (Phonetic Law)

---

[1] P. D. Gune. An Introduction to Com. Phil. Page 22

[2] ঐ ঐ Page 35

নামে অভিহিত হয়। উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি স্পষ্ট হ'তে পারে। আমরা যখন দেখি সং. ধূমঃ, গ্রী. থূমোস্, লা. ফুমোস্ ; সং. ভরতি, লা. ফেরো ; সং. রুধির, গ্রী. এরুথ্রোস্, প্রা. ইরা. রুঅদ্, লা. রুব্রোস্ ; সং. নভঃ, লা. নেবুলা ইত্যাদি, তখন আমরা একটি সাধারণ ধ্বনিসূত্রে উপনীত হই যে, মূল ভাষার সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি সংস্কৃতে রক্ষিত (ধ, ভ) কিন্তু লাতিন ভাষায় তাদের ঘোষবত্তা বিনষ্ট। আবার সংস্কৃত ধাতুরূপাদর্শে √ বুধ্ > বুধ্যতে, বোধামি এবং অভৌত্সীত্, √ বন্ধ্, কিন্তু অভান্তসীত্ ইত্যাদি নিরীক্ষণ ক'রে একটি সাধারণ সূত্র উপস্থাপিত করা হ'য়েছে, মূল ভাষায় ধাতুসমূহে নিশ্চয়ই তুটি সঘোষ-মহাপ্রাণ ছিল (ভন্ধ্, ভুধ্, প্রভৃতি) কিন্তু সংস্কৃতে তারা পাশাপাশি থাকতে পারে না এবং একটি সঘোষ অল্পপ্রাণে পরিণত হয়। এই সংস্কৃতের 'স্'-ধ্বনি আবেস্তীয় ভাষায় সর্বদাই হ্-রূপে দৃষ্ট। তুলনীয় সং. সপ্ত, সিন্ধু, আবে. হপ্ত, হিন্দু ইত্যাদি।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ধ্বনিপরিবর্তনের এই নিয়মকে ধ্বনি-সূত্র না ব'লে 'ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা বা ঝোঁক' (Phonetic tendency) বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ 'সূত্র' (law) শব্দটির মধ্যে 'প্রণয়ন'-অর্থটি প্রতীত হয় ; কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন নিয়ম কেউ ইচ্ছামত প্রণয়ন ক'রতে পারে না। ভাষা তার বিবর্তনের গতিপথে স্বাভাবিক ভাবে কয়েকটি পরিবর্তনের ঝোঁকের (tendency) শিকার হয়। এক সময়ের এই ঝোঁকগুলি ক্রমশঃ উত্তরকালে সদা অভ্যস্ত 'রীতি' বা 'নিয়মে' দাঁড়ায়। তাকে লক্ষ্য ক'রে, গ্রথিত রূপটি পরিবেশিত হ'লেই তাকে আর 'ধারা' না

ব'লে 'সূত্র' বলা হয়। বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী Tucker-এর অভিমতটি এবিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"A Phonetic law of a language is a statement of the regular practice of that language at a particular time in regard to the treatment of a particular sound or group of sounds in a particular setting."[1]

গ্রিমের ধ্বনিসূত্র [Grimm's Law]—য়াকোব্ গ্রিমের প্রণীত জার্মান ভাষাগোষ্ঠীর ধ্বনি-পরিবর্তন-সংক্রান্ত সূত্রটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মূল ই-ইউ. ভাষা এবং সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ভাষার সংগে জার্মানিক ভাষার তুলনাত্মক বিচারে দেখা যায় অন্য ভাষাগুলিতে মূল ভাষার অঘোষ-অল্পপ্রাণ (unvoiced non-aspirate) ধ্বনি অবিকৃত র'য়েছে, কিন্তু জার্মানিকে তা অঘোষ-মহাপ্রাণে (unvoiced aspirate) পরিণত। এবং মূল ভাষার সঘোষ-মহাপ্রাণ পরিণত হয় সঘোষ-অল্পপ্রাণে ও সঘোষ-অল্পপ্রাণ পরিণত হ'য়েছে অঘোষ-অল্পপ্রাণে (voiced aspirate > voiced non-aspirate এবং voiced non-aspirate > unvoiced non-aspirate) অর্থাৎ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির মধ্যে বর্গের ৪র্থ বর্ণ পরিণত ৩য় বর্ণে, ৩য় বর্ণ পরিণত ১ম বর্ণে এবং ১ম বর্ণ পরিণত ২য় বর্ণে। যেমন

সং. ভরামি, জা. বেরন্ (bairan), ইং. বীয়ার (bear)।

সং. গৌঃ, জা. কু (kuh), ইং. কাউ (Cow)। ই. ইউ.* $g^{w}\bar{o}us$

সং. ভ্রাতা, গ্রী. ফ্রাতের্, জা. ব্রুডার (< ব্রোথার্), ইং. ব্রাদার্।

ই-ইউ. * bhrātēr

---

[1] Taraporewalla Elements of the Science of Language. Page—148

সং. পঞ্চ, জা. ফ্যুন্‌ফ্ (fünf), ইং. ফাইভ. ই-ইউ. * penqʷe.
সং. পিতা, গ্রী/লা. পতের্, জা. ফাতের, গথিক. ফাডার,
ইং. ফাদার. ই-ইউ. * pətĕr.

এই ধ্বনিসূত্র জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর বিচার-বিশ্লেষণেই তৎপর। এই নিয়মটি বস্তুতঃপক্ষে প্রথম লক্ষ্য করেন অধ্যাপক রাস্ক্। গ্রিম্ তাকে বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপিত ক'রেছিলেন এইজন্য তাঁর নামানুসারে এই সূত্রের নামকরণ হ'য়েছে।

কিন্তু এই সূত্রের বহু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন ই-ইউ. * এস্তি > জার্মান 'ist' [প্রথম বর্ণ 'ত' দ্বিতীয় বর্ণে পরিণত হয় নি] > গ্রী. 'এস্তি', সং. 'অস্তি'।

ই-ইউ. * স্পর্ক্ > প্রা-ভা-আ. 'স্পশ্', ইং. 'স্পাই', জা. 'spehen'. [জার্মানিকেও প্রথম বর্ণ 'প' অবিকৃতভাবে রক্ষিত]

এই ব্যতিক্রমসমূহকে লক্ষ্য ক'রে গ্রিমের ধ্বনিসূত্রের কিছু সংস্কারসাধন সম্পন্ন ক'রে ডেন্‌মার্কদেশীয় বিশেষজ্ঞ কার্ল ভের্‌নার (Karl Verner) তাঁর ধ্বনিসূত্র প্রস্তাবিত ক'রলেন [Verner's Law]. এই সূত্রও জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর ধ্বনিপরিবর্তনের ধারার দিগ্-দর্শনের সহায়ক। এই সূত্রের বক্তব্য—গ্রিমের সূত্র অনুযায়ী উল্লিখিত ধ্বনিপরিবর্তন স্বর-এর (accent) উপর নির্ভরশীল ছিল। পরিবর্তনযোগ্য ধ্বনিটির দূরবর্তী কোন পূর্বস্থিত বর্ণে যদি স্বর থাকে তবেই উক্ত পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু যদি ঐ বর্ণের অব্যবহিত পূর্বস্থিত অথবা বর্ণটির পরস্থিত ধ্বনিটি স্বরাঙ্কিত হয় তবে ধ্বনি-পরিবর্তনের ঝোঁকটি অন্য প্রকার হয়। এই অবস্থায় অঘোষ অল্পপ্রাণ (unvoiced non-aspirate) সঘোষ অল্পপ্রাণে পরিণত হয়

অর্থাৎ স্পৃষ্ট বর্গের প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়, দ্বিতীয় বর্ণে নয়। সুতরাং, দেখা যায়—

ই-ইউ * ক্লু́তোস্ (k̂lutós)>প্রা-ভা-আ. শ্রুতঃ

এখানে 'ক্লুতোস্' শব্দে 'ত'-এর অব্যবহিত পরস্থিত 'ও'-ধ্বনি স্বরযুক্ত (accented), ফলে ত্>দ্, 'থ্' নয়।
>গ্রীক ক্লুতোস্
>গথিক খ্লুদ্
[ইং. লাউড্]

এই রকম, ই-ইউ * সেপ্ত্ন্ (Septn̥')>জার্মান্ 'Sieben' (জ়ীবেন্)
>সং. 'সপ্ত'।

" * র্ক্ম্তোম্ (k̂m̥tóm)>গথিক খুন্দ্,
>ইং. hundred.
>জা. hundert.
>সং. শতম্

এই উদাহরণ দু'টিতে যথাক্রমে 'ন্' ও 'ও' ধ্বনি স্বরযুক্ত ব'লে তার পূর্ববর্তী 'প্' ও 'ত্' ধ্বনিদ্বয় যথাক্রমে 'ব্' ও 'দ্' ধ্বনিতে রূপান্তরিত।

ভের্নার্-এর ধ্বনিসূত্র আরো একটি বিষয় ব্যাখ্যা করে। জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীতে 'স্' (s) ধ্বনির পূর্বে যদি স্বর (accent) না থাকে তবে তা সাধারণতঃ 'জ়্' (z)-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। তাই জার্মান ভাষায় যদিও 'sieben', 'sehen', লেখা হয়, উচ্চারণের সময়ে 'জ়ীবেন্', 'জেহ্ন্' পড়তে হয়।

গ্রাস্‌মান্‌-এর ধ্বনিসূত্র [Grassmann's Law]—সংস্কৃত-ভাষাতত্ত্বের বিচার প্রসঙ্গে এই সূত্রের উপযোগিতা অপরিসীম। সং. 'বন্ধ্‌', গ্রী. 'পেন্থ্‌', জা. 'বিন্দেন্‌', ইং. 'বাইণ্ড্‌' ইত্যাদি শব্দসমূহ হ'তে অনুমান করা যেতে পারে মূল ই-ইউ. ভাষায় শব্দটি ছিল * 'বেন্ধ্‌' (bendh)। কিন্তু তা হ'লে জার্মানিকে 'ব্‌'-ধ্বনি তো 'প্‌'-তে পরিণত হওয়া উচিত। এই সমস্যার সমাধান ক'রলেন গ্রাস্‌মান (১৮০৯-১৮৭৭)। এই ধ্বনিসূত্র প্রমাণ ক'রল মূল ই-ইউ. ভাষার পাশাপাশি দুটি অক্ষরে দুটি মহাপ্রাণ বর্ণ থাকলে গ্রীক ও ইন্দো-ইরাণীয় (তথা ভারতীয় আর্যে) ভাষাতে তাদের একটি, সাধারণতঃ প্রথমটি অল্পপ্রাণে পরিণত হ'য়েছে। যেক্ষেত্রে প্রথমটি মহাপ্রাণরূপেই বিবর্তিত, সেখানে দ্বিতীয় অক্ষরের মহাপ্রাণটি অবশ্যই অল্পপ্রাণে পরিবর্তিত হয়। গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি-সমূহের বিবর্তনের পক্ষে এই সূত্রের উপযোগিতা লক্ষ্যণীয়। গ্রীকভাষায় অবশ্য সঘোষ-বর্ণ আগেই অঘোষ বর্ণে পরিণত হয়, তারপরে অল্পপ্রাণ হয়। সুতরাং ভ্‌>ফ্‌>প্‌ এই ক্রমে গ্রীকে ধ্বনিপরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে। সুতরাং উল্লিখিত শব্দসমূহ মূল ই-ইউ. ভাষার 'ভেন্ধ্‌' শব্দ হ'তে উদ্ভূত। সংস্কৃতে প্রথম অক্ষরের (syllable) মহাপ্রাণ 'ভ্‌' 'ব'-তে পরিণত। জার্মানিকেও সঘোষ মহাপ্রাণ সঘোষ অল্পপ্রাণে (চতুর্থ বর্ণ>তৃতীয় বর্ণ) পরিণত হ'য়ে 'binden', 'bind' ইত্যাদি হ'য়েছে। গ্রীকের ক্রম-অনুসারে হ'য়েছে 'পেন্থ'। তুলনীয় অন্য উদাহরণ—

ই-ইউ. * ভেউধোমাই (bheudhōmai)>সং. বোধামি।
>গ্রী. পেউথোমাই।

সংস্কৃত ভাষার 'ধা', 'ফল্', 'ভূ' প্রভৃতি ধাতুসমূহের অভ্যস্ত (reduplicated) রূপগুলির পর্যালোচনা এই বিষয়টিকে স্পষ্টতর করে।

√ভূ>বভূব, √ধা>দধামি, √ফল্>পফাল, √ভৃ>বভার, ইত্যাদি; কিন্তু অনভ্যস্ত অবস্থায় এই ধাতুগুলি হ'তেই যথাক্রমে ভবতি, ধত্সে, ফলতি, ভরামি ইত্যাদি রূপ গঠিত হয়। আরও বলা যায় সংস্কৃতে ধাতুটি 'বুধ্' (>বোধামি) হ'লেও তার থেকে ভোত্স্যতি রূপ গঠিত হয়। এখানে প্রথম অক্ষরের মহাপ্রাণত্ব রক্ষিত হ'য়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় অক্ষরে 'ধ্' তার মহাপ্রাণত্ব হারিয়ে 'ত্'-তে পরিণত।

বার্থলোমে-র সূত্র (Bartholomae's Law)—বিখ্যাত ইরাণী পণ্ডিত বার্থলোমে ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার প্রাচীন স্তরে সংঘটিত ধ্বনি পরিবর্তনের একটি ধারাকে সূত্রাকারে উপস্থিত করেন। এই সূত্রের বক্তব্য একটি সঘোষ-মহাপ্রাণ (voiced aspirate) বর্ণের অব্যবহিত পরেই যদি একটি অঘোষ-অল্পপ্রাণ (unvoiced non-aspirate) বর্ণ থাকে তবে এই যুগ্মধ্বনিটি সঘোষ-অল্পপ্রাণ ও সঘোষ-মহাপ্রাণের যুগ্ম-ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—

ই-ইউ. * ধুঘ্ত (dhughta)>প্রা-ভা-আ. দুগ্ধ।

{ ঘ্=সঘোষ মহাপ্রাণ, ত=অঘোষ অল্পপ্রাণ।
ঘ্ত>গ্ধ; গ্=সঘোষ অল্পপ্রাণ, ধ্=সঘোষ মহাপ্রাণ।
প্রথম অক্ষরের ধ্>দ্, গ্রাস্‌মান্-এর সূত্রানুসারে।

অন্য উদাহরণ—ই.ইউ. * বিধ্ত (vidhta)>প্রা-ভা-আ. বিদ্ধ
" * লভ্ত (labhta)> " লব্ধ।

কোলিত্‌স্‌-এর সূত্র (Collitz's Law)—সংস্কৃত-ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এই সূত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতে নতুন সৃষ্ট চ-বর্গের ঐতিহাসিক বিবর্তন এই সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। চ-বর্গ তালব্য বর্ণসমূহের গুচ্ছ। এ ছাড়া আগেই ছিল তালব্য শিষ্‌ ধ্বনি (palatal sibilant) 'শ্‌' (ś)। এই 'শ্‌'-এর উৎস ই-ইউ. কণ্ঠতালব্য 'ক্‌' (k̑) ধ্বনি। একে প্রথম তালব্যীভবন (first palatalisation) বলা হ'য়েছে। সুতরাং কোলিত্‌স্‌ যখন প্রমাণ ক'রলেন তালব্য স্বর অর্থাৎ 'ই', 'এ', এবং 'ঈ' ও দীর্ঘ 'এ' এবং অর্ধস্বর 'য্‌'-এর পূর্ববর্তী পশ্চাৎকণ্ঠ্য (velar) ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য (labio-velar) ধ্বনিসমূহ সংস্কৃত ভাষার চ-বর্গের উৎস, তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত ধ্বনিসূত্রকে তালব্যীভবনের দ্বিতীয় সূত্র (Second Law of Palatalisation) বলা হ'ল।

উদাহরণ—ই-ইউ. * ক্বিদ্‌ > সং. চিত্‌,
" * কু̯কিস্‌ > সং. শুচিঃ ইত্যাদি।

[এই প্রসংগের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ৯৯ পৃষ্ঠাতে পশ্চাৎকণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণসমূহের বিবর্তন-প্রসঙ্গে আলোচিত হ'য়েছে; বিশ্লেষণ ও উদাহরণসমূহ দ্রষ্টব্য।]

এছাড়া ফর্তুনাতোভ্‌-এর ধ্বনিসূত্র সংস্কৃতভাষার মূর্দ্ধন্যবর্ণসমূহের উৎস সন্ধানে সহায়তা করে। [এই সূত্র-সম্পর্কে ৯১ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

এর পরে ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি বিশিষ্ট ক্রম ও ধারার প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

অপশ্রুতি (Ablaut)—মূল ভাষার প্রায় সব শাখারই প্রাচীন স্তরে স্বরধ্বনিগত একটি বিশেষত্ব রক্ষিত হ'য়েছে। স্বরধ্বনির

পরিবর্তনের একটি বিশেষ ক্রম লক্ষিত হ'লে তাকে অপশ্রুতি বা (Ablaut) নামে চিহ্নিত করা হয়। বস্তুতঃ পক্ষে, একই ধাতু বা শব্দ হ'তে বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন একাধিক শব্দের মধ্যস্থিত স্বর-ধ্বনির নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে রূপান্তরকে অপশ্রুতি, বা স্বরক্রম (Ablaut or vowel gradation) বলা হয়। স্বরধ্বনির পরিমাণ ও স্বরূপ অনুসারে এই স্বরক্রম দু'ভাগে বিভক্ত (Quantitative and Qualitative Ablaut)। স্বরূপগত বিচারে স্বরক্রমে দুটি ধারা লক্ষিত —'এ'-ধ্বনির বিভিন্ন রূপ এবং 'ও'-ধ্বনির বিভিন্ন রূপ। পরিমাণগত বিচারে অপশ্রুতির তিনটি ক্রম—গুণ (strong grade), বৃদ্ধি (lengthened grade) এবং ক্ষীণক্রম (weak-grade or nil-grade)। ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্তন অন্যান্য ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। যেমন ইংরাজীতে sing = গান করা, ঐ ধাতু হ'তে অতীতকালের রূপ sang, প্রাত্যয়িক রূপ sung, ঘটমান প্রাত্যয়িকে আবার singing হয়। জার্মান ভাষায় sehen = দেখা, অতীতে sah, প্রাত্যয়িক gesehen ইত্যাদি। এই পরিবর্তন গুণ বা স্বরূপগত। স্বরধ্বনির পরিনামগত পরিবর্তন 'এ'>ই, ও>উ, ঋ>অর্ অথবা ই>এ, উ>ব, অথবা য, ব, র্> যথাক্রমে ই, উ, ঋ অথবা অ>আ, ঋ>আর্ ইত্যাদি। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা ধাতুস্বরের হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং ক্ষয়িত রূপের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে তাদের নামকরণ ক'রেছিলেন গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় এদেরই নাম যথাক্রমে গুণিত (strengthened) বা সাধারণ (normal), বৃদ্ধি (lengthened) এবং ক্ষীণ (weak/nil) ক্রম (grade)। উদাহরণ সহযোগে বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

√স্বপ >ক্ষীণক্রমে পাওয়া যায় সুপ্ত, সুপ্তি। 'ব' সম্প্রসারিত হ'য়ে 'উ'-তে পরিণত।

>স্বাপ পাই দীর্ঘ ক্রমে। ধাতুস্বর 'অ' 'আ'-তে পরিণত।

>স্বপ্ন, স্বপিতি ইত্যাদি সাধারণ বা গুণক্রমেই রক্ষিত।

√ভৃ>'ভরে'—গুণিত ক্রম, 'বভার'—দীর্ঘক্রম, 'বিভ্রতি'—ক্ষীণক্রম, 'ভৃতি'—সাধারণ/অবিকৃত ক্রম।

√অস্>সন্তি—গুণিত ক্রম, কিন্তু 'অস্তি'-রূপের মধ্যে 'স্'-এর সংগে যুক্ত 'অ' লুপ্ত, সুতরাং তা ক্ষীণক্রমের রূপ।

√ই >এতি, এমি গুণিত রূপ।

>ইতঃ, ইমঃ ক্ষয়িত রূপ।

√যজ্ > ইষ্ট সম্প্রসারিত/ক্ষয়িত রূপ।

>যজ্ঞ, যষ্টুম্ সাধারণ বা গুণিত রূপ।

>ইয়াজ দীর্ঘক্রম। 'য'-এর 'অ' 'আ'-তে পরিণত।

√ভূ>গুণিত 'ভবতি', দীর্ঘ 'ভাবয়তি', ক্ষয়িত 'ভূত্বা'।

√দৃশ >দৃষ্ট, দদর্শ, দদৃশুঃ ধাতুর স্বরক্রমেরই পরিচায়ক।

ধাতুর স্বরধ্বনির এই পরিবর্তন যা অপশ্রুতি নামে চিহ্নিত তা স্বরসঙ্গার এবং সমীভবনের প্রবণতার প্রতি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সাদৃশ্য (Analogy)—ধ্বনি পরিবর্তনের যে কোন ধারা বা নিয়মিত ক্রমের পক্ষে সাদৃশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষাতত্ত্বের বিচারে সাদৃশ্য একটি বিশিষ্ট উপাদানরূপে স্বীকৃত। ধ্বনিসূত্র সমূহের ব্যতিক্রমগুলিকে সাদৃশ্য-ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কারণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

অন্যের দ্বারা উচ্চারিত শব্দসমূহের শ্রবণ এবং নিজে সেই শব্দসমূহকে উচ্চারণ করার সময়ে কোন মানুষই সেগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে গ্রহণ করে না। শ্রবণ মাত্রেই মানুষের মনে তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠতা অনুসারে কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত হ'য়ে সংস্কার (impression) আরোপ করে। এই ধ্বনিগুচ্ছগুলিও পরস্পর সংগতিপূর্ণ; ফলে মাঝে মাঝে এক গুচ্ছের একটি শব্দের সংগে অপরগুচ্ছের একটি শব্দ গঠনের মধ্যে বিপর্য্যাস ঘটে। ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনি-পরিবর্তনের বিশ্লেষণের বিষয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে ধ্বনিগত ও অর্থগত উভয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই ভাব ও মানসিক সংস্কারের দলবিভাগ সর্বপ্রকার সাদৃশ্যজনিত রূপগঠনের মূল ভিত্তি। "This association of the ideas or impressions of words in the brain, is the basis of all analogy formation i.e., the second important kind of linguistic change".[1]

মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানরূপে স্বীকৃতিলাভের পূর্বে ভাষাতত্ত্বে স্বীকৃত ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মিত ধারা বা সূত্রের বহির্ভূত প্রয়োগসমূহকে শুধুমাত্র ব্যতিক্রমরূপেই চিহ্নিত করা হ'ত; তাদের বিষয়ে যুক্তি-সম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না। ভাষার অগ্রগতি ও বিকাশের সংগে সংগে এই ব্যতিক্রমগুলির সংখ্যা এতই বাড়তে লাগল যে তাদের কোন যুক্তি-গ্রাহ্য ব্যাখ্যার আওতায় না সন্নিবিষ্ট ক'রলে ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিই প্রায় ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় ১৯শ শতকের শেষভাগে Brugmann, Osthoff প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানকল্পে এগিয়ে

[1] Dr. P. D. Gune—An Introduction to Comp. Phil. Page—68

এলেন। ধ্বনি-বিবর্তনের পক্ষে মানুষের মনোগত সাদৃশ্যবোধকে অন্যতম যুক্তিপূর্ণ কারণরূপে উপস্থাপিত করা হ'ল। এই প্রভাব ধ্বনিগত ও অর্থগত দুই প্রকারই হয়। কেউ কার্যগত সাদৃশ্যকেও স্বীকার ক'রেছেন। সাদৃশ্যজনিত প্রভাবের ফলে ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণরূপে কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যায়। সংস্কৃতে কোলিত্‌স্‌-এর ধ্বনিসূত্র অনুসারে ই-কারের পূর্ববর্তী পশ্চাৎকণ্ঠ্য ক্‌-ধ্বনি 'চ'-তে পরিণত হয়। সুতরাং ই-ইউ. 'কিম্‌' (qim) শব্দ হ'তে সংস্কৃতে 'চিম্‌' পদ গঠিত হ'তে পারত; কিন্তু কম্‌, কঃ ইত্যাদির সংগে সাদৃশ্যবোধবশতঃ 'কিম্‌' পদ গঠিত হ'য়েছে। এটিকে উক্ত ধ্বনি-সূত্রের ব্যতিক্রম রূপেই উল্লেখ করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা আরও বলেন, ইংরাজীতে always, lengthways, sideways ইত্যাদি ক্রিয়া-বিশেষণগুলিতে প্রত্যেকটির শেষে একটি 's' আছে ব'লেই, সদৃশ ক্রিয়াবিশেষণ 'sometimes' শব্দে অর্থগত কোন প্রয়োজন না থাকলেও একটি 's' যুক্ত হ'য়েছে। 'shall', 'will' প্রভৃতি শব্দ হ'তে উৎপন্ন should, would শব্দে 'l'-উপাদান স্বাভাবিক হ'তে পারে, কিন্তু 'can' থেকে উৎপন্ন 'could' পদে 'l'-এর আগমনের কোন যুক্তি নেই। এখানেই বলা হ'য়েছে should, would এর সাদৃশ্যে could শব্দেও এক 'l'-উপাদান যুক্ত হ'য়েছে। ছোট বাচ্চারা কথা বলার সময়ে ভুল ক'রে হয়ত 'no, it is not' এর মত 'so, it is sot' ব'লে ফেলে। তার মনে যে চিন্তা কাজ করে তা হ'ল, 'no' থেকে অনুরূপ পদ 'not', সুতরাং 'so' থেকে 'sot' হ'তে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে সাদৃশ্যজনিত ধ্বনিপরিবর্তনের ঝোঁক ধ্বনিসূত্রের মত একটি ভাষার ধ্বনি-বিবর্তনের ধারাকে সামগ্রিক-

ভাবে প্রভাবিত করে না ; কিছু শব্দগঠন, প্রাত্যয়িক প্রয়োগ, বাক্যগঠন ও শব্দার্থের বিবর্তনের পক্ষে আংশিক প্রভাব বিস্তার করাতেই এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে। "Analogical change does not touch the pronunciation of a language as a whole, as a phonetic change does ; it chiefly affects formation of words, inflection, syntax and meaning of words or group of words."[1]

শব্দগঠনে সাদৃশ্যজনিত প্রভাব—বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি ; এখানে স্-ধ্বনি স্বাভাবিক ; কিন্তু 'রথস্পতি', 'ঋতস্পতি' শব্দে তার কোন রীতিসিদ্ধ ব্যবহারের সুযোগ না থাকলেও পূর্বোক্ত শব্দের সাদৃশ্যে এই দুটি শব্দেও 'স্'-রক্ষিত। এই রকম দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদের স্বরের দীর্ঘত্বের বিষয়ে ইন্দ্রাগ্নী, ইন্দ্রামরুতৌ প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে 'অগ্নামরুতৌ' শব্দ গঠিত। ইন্দ্র>দীর্ঘরূপ ইন্দ্রা স্বাভাবিক, কিন্তু অগ্নি>অগ্নী হওয়া উচিত। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা পূর্ব সদৃশ 'অগ্না' পেলাম। সংস্কৃতে 'ত্রীণি'-র সাদৃশ্যে নিশ্চয়ই 'দ্বীণি' শব্দ ছিল, যার থেকে পরবর্তীকালে বাংলায় 'বেণি' শব্দ উৎপন্ন। 'ত্র্যশীতি', 'ত্রিনবতি' প্রভৃতি হ'তে বাংলায় 'তিরাশী', 'তিরানব্বই' প্রভৃতি শব্দে 'র্' স্বাভাবিক, কিন্তু দ্ব্যশীতি, দ্বিনবতি শব্দে 'র্' না থাকলেও পূর্বোক্ত শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্যে বাংলায় 'বিরাশী', 'বিরানব্বই'—শব্দেও 'র্' রক্ষিত।

প্রাত্যয়িক ব্যবহারে সাদৃশ্যের উদাহরণ—স্ত্রীলিঙ্গে চতুর্থী ও পঞ্চমী বিভক্তির একবচনের বিভক্তিটি নিশ্চয়ই যথাক্রমে 'ঐ', 'আঃ'

1. P. D. Gune. An Introduction to Comp. Phil. Page-70.

ছিল ; ফলে 'দেবী' শব্দ হ'তে উল্লিখিত বিভক্তিদ্বয়ে যথাক্রমে স্বভাবতঃ 'দেব্যৈ' ও 'দেব্যাঃ' পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু 'প্রিয়া' শব্দের রূপ গঠনের সময়ে আমরা দেখি প্রিয়ায়ৈ, প্রিয়ায়াঃ ইত্যাদি। সুতরাং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান, 'দেব্যৈ,' 'দেব্যাঃ'—ইত্যাদি দেখে মনে হ'য়েছিল বিভক্তিটি 'যৈ' এবং 'যাঃ' ; তারই ফলে প্রিয়া ইত্যাদি আকারান্ত শব্দেও তার সাদৃশ্যে প্রিয়ায়ৈ, লতায়ৈ, প্রিয়ায়াঃ, লতায়াঃ ইত্যাদি রূপ গঠিত। অন্য উদাহরণ প্রদর্শিত হ'য়েছে 'নপাত্‌' শব্দের রূপ-গঠনের ক্ষেত্রে। তাঁদের মতে পিতৃ, ভ্রাতৃ, স্বসৃ ইত্যাদি পারিবারিক সম্পর্কবোধক শব্দগুলির সাদৃশ্যেই ৪র্থী, ৫মী, ৬ষ্ঠী ইত্যাদিতে পিত্রে, ভ্রাত্রে, পিতুঃ, ভ্রাতুঃ ইত্যাদির সাদৃশ্যেই 'নপাত্‌' শব্দেরও নপ্ত্রে, নপ্তুঃ ইত্যাদি পদ হয় ; অন্যথায় ঋ-কারান্ত শব্দের রূপের সংগে 'নপাত্‌' শব্দের সংগতি সম্ভব ছিল না। 'নপাত্‌' শব্দের অর্থ 'নাতি' (grandson)।

সাদৃশ্যজনিত বাক্যরীতির বৈচিত্র্য—পরস্পর আপাত সদৃশ দুটি বাক্য অনেক সময়ে পরস্পর সংমিশ্রিত হ'য়ে এক অদ্ভুত নতুন বাক্যের সৃষ্টি করে। চলিত বাংলায় একে জোড়কলম বলা হয়। ইংরাজীতে একে analogical contamination বলা হ'য়েছে। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ Oertel একটি চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে এটি স্পষ্ট-ভাব্যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন[1]—তিনি ব'লেছেন ইংরাজীর আপাত অশুদ্ধ "Living in what to the Chinese is regarded as wealth" বাক্যটি দুটি বাক্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। সেই দুটি নিম্নরূপ—

(১) Living in what by the Chinese is regarded as wealth.

(২) Living in what to the Chinese seems wealth.

[1] দ্রষ্টব্য P. D. Gune—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ 74

উচ্চারণের প্রয়াসের সংক্ষেপীকরণ, অক্ষমতা অথবা পুনরাবৃত্তির ত্রুটিজনিত কয়েকটি ধ্বনি-পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে অবশ্য প্রয়োজন।

(১) **সমীভবন (assimilation)**—উচ্চারণের সময়ে পরস্পর সন্নিহিত দুটি ভিন্ন ধ্বনির একটির প্রভাবে অপরটির উচ্চারণ-প্রকৃতির যে সাম্যজনিত পরিবর্তন ঘটে, সেই প্রক্রিয়ার নাম সমীভবন। এই সমীভবন প্রগত (progressive), পরাগত (regressive) এবং অন্যোন্য (mutual) ভেদে ত্রিবিধ। পূর্বস্থ ধ্বনির সাদৃশ্যে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন প্রগত সমীভবন; যথা চক্র>প্রা. চক্ক, বজ্র>প্রা. বজ্জ। পরের ধ্বনির প্রভাবে পূর্বস্থিত ধ্বনির তৎসদৃশ সমতা লাভ পরাগত সমীভবন; যেমন, মুক্তা>প্রা. মুত্তা, কার্য>প্রা. কজ্জ, ধর্ম>ধম্ম। অন্যোন্য সমীভবনে সন্নিকৃষ্ট দুটি ধ্বনিরই পরস্পরসদৃশ একটি পরিবর্তিত রূপ হয়; যেমন সত্য>প্রা. সচ্চ।

(২) **বিষমীভবন (dissimilation)**—পদমধ্যস্থ দুটি সমধ্বনির একটির বিষম পরিবর্তন ঘটলে তাকে বিষমীভবন বলা হয়। যেমন, পিপীলিকা>প্রা. কিপিল্লিকা, মুকুট>প্রা. মউড (বাংলায় মটুক), পুরুষ>প্রা. পুরিস, ললাট>প্রা. নলাট। শরীর>বাংলায় শরীল। চিকীর্ষতি>পালি. তিকিচ্ছতি।

(৩) **বর্ণবিপর্যয় (metathesis)**—দ্রুত উচ্চারণের সময়ে পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনির পারম্পর্য অনেক সময়ে ব্যাহত হয়। অর্থাৎ তারা উভয়ে স্থান পরিবর্তিত ক'রে একটি অন্যটির স্থানে উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম বর্ণবিপর্যয়। এর চমৎকার

উদাহরণ সংস্কৃত 'বারাণসী' শব্দ হ'তে প্রাদেশিক 'বেনারসী' শব্দের উদ্ভব। অন্য উদাহরণ ইব>পা. বিঅ, হ্রদ>পা. দহ, স্না>প্রাদেশিক ন্‌হানা, প্রত্যভিজ্ঞান>প্রাদেশিক পহ্‌ছান ইত্যাদি।

(৪) **বর্ণাগম (Prothesis)**—উচ্চারণের সুবিধার্থে অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ শব্দের আদিতে কোন ধ্বনি বা বর্ণের আগম হ'লে তাকে বর্ণাগম বলা হয়। সাধারণতঃ শব্দের আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকলে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। যেমন 'স্ত্রী' শব্দ উচ্চারণ করার সময়ে সাধারণ মানুষে 'ইস্ত্রী' উচ্চারণ ক'রে থাকে। স্নান> প্রাদেশিক আস্নান, ষ্টেশন>ইষ্টেশন ইত্যাদি। স্বরের পূর্বে ব্যঞ্জনের আগম, যথা এব>প্রা. জেব। (ইং. stable>আস্তাবল)।

(৫) **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (anaptyxis)**—ছন্দের প্রয়োজনে বা যুক্তব্যঞ্জনকে সহজে উচ্চারণ করার প্রয়োজনে সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে বিশ্লিষ্ট ক'রে তার মধ্যে সুবিধামত স্বরধ্বনিকে উচ্চারণের রীতিকে স্বরভক্তি বলা হয়। যথা, ইন্দ্র > ইন্দর, কৃষ্ণ > অর্ধমাগধী কসিণ, স্পর্শ > অ. মা. ফরিস, বাংলায় পরশ। ধর্ম > প্রাদেশিক ধরম, স্মর > সুমর (গানে) ইত্যাদি। পৃথ্বী এবং পৃথিবী শব্দদ্বয় স্বরভক্তির অস্তিত্বের চমৎকার উদাহরণ। তুলনীয় অন্য উদাহরণ স্বর্ণ, সুবর্ণ ; সুন্দরী, সূনরী (বৈদিক)।

(৬) **অপিনিহিতি (epenthesis)**—পদমধ্যস্থ কোন স্বরবর্ণ স্বস্থানে উচ্চারিত হ'য়েও পূর্বেও আর একবার উচ্চারিত হ'লে তাকে অপিনিহিতি বলা হয়। আবেস্তীয় এবং সংস্কৃত শব্দাবলীর তুলনামূলক তালিকা এই প্রক্রিয়ার নিদর্শনের পক্ষে চমৎকার ফলপ্রসূ। যেমন, সং. ভবতি, আবে. ভবৈতি (ঐ=অই) ; সং.

অরুষঃ, আবে. অউরুষো ; সং. এতি, আবে. অইতি ইত্যাদি। চলিত বাংলার উদাহরণঃ করিয়া > কইর‍্যা, জ্বলিয়া > জ্বইল্যা ইত্যাদি।

(৭) **বর্ণলোপ**—অনায়াস উচ্চারণের প্রয়োজনে বর্ণাগমের মত কখনও আবার বর্ণলোপ ঘটে। বর্ণলোপের প্রধান কারণ সাধারণতঃ শ্বাসাঘাতের অভাব। তার ফলে পদের আদি বর্ণ অনেক সময়ে লুপ্ত হয়। তাকে **আদিবর্ণলোপ** (aphesis/apheresis) বলা হয়। যেমন, ইদানীং > প্রা. দানি, অলাবু > বাংলায় লাউ। অরণ্য > প্রা. রণ্ণ ইত্যাদি। পদের মধ্যস্থলে অবস্থিত অর্থাৎ উচ্চারিত ধ্বনি শ্বাসাঘাতের অভাবে লুপ্ত হ'লে তাকে **মধ্যবর্ণলোপ** (syncopation) বলা হয়। যেমন, সং. দেবকুল > প্রাকৃতে দেউল, রাজকুল > প্রা. রাউল ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপ গঠনের মধ্যে মধ্যবর্ণলোপের প্রক্রিয়া খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। যেমন √গম্ ধাতু হ'তে 'জগ্মুঃ' পদ গঠিত, যেখানে 'গ্'-এর সংগে যুক্ত ধাতুর 'অ' লুপ্ত। তুলনীয় অপর উদাহরণ রাজন্ > রাজ্ঞা, প্রেমন্ > প্রেম্‌ণা। পদান্ত বর্ণের লোপ ঘটলে তাকে **অন্ত্যবর্ণলোপ** (apocope) বলা হয়। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ খুব বেশী ঘটেছে। যেমন দেবাত্ > দেবা, ষট্ > ছ ইত্যাদি।

(৮) শ্বাসাঘাতের অভাবে বা উচ্চারণের সরলীকরণের জন্য পদমধ্যস্থিত পরস্পর সন্নিহিত দুটি অক্ষরের (বর্ণের নয়) একটির লোপ ঘটলে তাকে **সমাক্ষর লোপ** (haplology) বলা হয়। সংস্কৃত 'হৃদয়' শব্দ হ'তে অর্ধমাগধী প্রাকৃতে 'হিয়' এই প্রক্রিয়ার ফলে

উৎপন্ন। সংস্কৃতে জহীহি, জহি, শস্প + পিঞ্জরঃ > শষ্পিঞ্জরঃ এই প্রক্রিয়ার চমৎকার উদাহরণ। পতত্ + অঞ্জলি = 'পতঞ্জলি' রূপটি আরও পরিচিত নিদর্শন।

(৯) **স্বরাঘাত ও শ্বাসাঘাত (pitch accent and stress-accent)** —যে কোন শব্দকে উচ্চারণ করার সময়ে শব্দটির একটি বিশেষ অংশের উপর জোর বা ঝোঁক দিলে তার ফলে শব্দটির মধ্যে সামগ্রিক ভাবে কিছু ধ্বনিবৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। উচ্চারণের সময়ের এই ঝোঁক বা আহনন প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে accent বলা হ'য়েছে। এই আহননপদ্ধতি দু'ভাবে সাধিত হয়। অনেক সময়ে শব্দের একাংশের উচ্চারণের প্রয়োজনে প্রাণবায়ু অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, ফলে সেই অংশ বা অক্ষরটিকে অপরগুলির তুলনায় অধিক জোরালো মনে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম শ্বাসাঘাত। শ্বাসাঘাতের ফলে প্রাণিত বা accented অক্ষরটির পরবর্তী-অক্ষরের স্বরবর্ণটি প্রায় অনুচ্চারিত থেকে যায়। ইংরাজী 'literature' শব্দে 'li' এই অক্ষরের উপর অধিক প্রাণবায়ু প্রযুক্ত হওয়ার ফলে 'te' অক্ষরের স্বরবর্ণটির উচ্চারণ প্রায় অনুভূত হয়ই না। উচ্চারণের সময়ে 'লি-ট্‌রেচর' এইরকম শোনা যায়। 'present' শব্দটিও অনুরূপ উদাহরণ। 'pre' অংশটি প্রাণিত, ফলে উচ্চারিত শব্দটি 'প্রেজ্‌ন্ট্' এই রকম শোনা যায়। উচ্চারণের সময়ে জোর দেবার দ্বিতীয় প্রকার হ'ল স্বরাঘাত বা স্বরসঞ্চার। এই প্রক্রিয়াতে যে অক্ষরটি যেরূপ স্বরাঙ্কিত তার উচ্চারণের প্রয়োজনে কণ্ঠস্বর ওঠা নামা করে। উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত অক্ষর উদাত্ত ; অতিনিম্নে উচ্চারিত ধ্বনি অনুদাত্ত : এর মাঝে অন্য ক্রমও

চিহ্নিত থাকে। স্বরসঞ্চারের প্রভাবে স্বরধ্বনির প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। ই-ইউ. ভাষার অপশ্রুতি বা স্বরক্রমের পক্ষে স্বরাঘাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণরূপে বিবেচিত। স্বরাঘাতের ফলে ই-কার এ-কারে পরিণত হয়, এবং উ-কার অনেক সময়ে ও-কারে পরিণত হয়।

শব্দের অর্থের পরিবর্তনের পক্ষেও স্বরসঞ্চার ও শ্বাসাঘাত উভয় প্রক্রিয়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। [ইন্দ্রশত্রু-র উদাহরণ স্মরণীয়]। 'তুমি খাচ্ছ' অথবা 'আমি বলেছি' ইত্যাদি বাক্যে কোন্ শব্দের উপর জোর দেওয়া হোল, তার উপরেই তাদের অর্থ নির্ভর করে। ফলে উক্ত ইতিবাচক বাক্য দুটি অনায়াসেই প্রশ্নবোধকে পরিণত হ'তে পারে। কোন নতুন শব্দ ব্যবহার না ক'রে তারাই আবার বিস্ময়বোধকও হ'তে পারে। আবেস্তীয়, লাতিন, আধুনিক গ্রীক, ফার্সী, ইংরাজী ভাষায় শ্বাসাঘাত জাতীয় ঝোঁক দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃত, এবং হোমার লিখিত গ্রীক ভাষায় স্বরারোহ বা স্বরসঞ্চার দেখা যায়।

Ref. **P. D. Gune.** **An Introduction to Comp. Philology.**
Taraporewalla **Elements of the Science of Language.**
Thumb **Das Handbuch des Sanskrit.**
সু. সেন ভাষার ইতিবৃত্ত

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৈদিক ব্যাকরণ-এর বৈশিষ্ট্য

বৈদিক ভাষার আরও কিছু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা ব্যতিরেকে আমাদের উদ্দিষ্ট এই ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষার নিরীক্ষণ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুতরাং এখানে বৈদিক ব্যাকরণ প্রয়োগসমূহের কয়েকটি আঙ্গিকের অবতারণা করা হ'ল।

বৈদিক উপসর্গ (Vedic prefixes)—উপসর্গের বহুল এবং বিচিত্র ব্যবহার ভারতীয় আর্যভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ। তারা সাধারণতঃ ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে বসে এবং ধাতুর অর্থকে পরিবর্তিত করে। পাণিনি সূত্র প্রণয়ন ক'রেছেন—"উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে"। "তে প্রাগ্ ধাতোঃ।" এছাড়া কারিকা পাই—

"উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদ্ অন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহারবত্॥"

অন্যত্র বলা হ'য়েছে—"ধাত্বর্থং বাধতে ক্বচিত্ ক্বচিত্ তমনুবর্ততে।
বিশিনষ্টি তমেবার্থম্ উপসর্গগতিস্ত্রিধা॥

উপসর্গ সম্পর্কে নিরুক্তকার যাস্ক ব'লেছেন চতুর্বিধপদের অন্যতম হ'চ্ছে উপসর্গ এবং তার অর্থদ্যোতকতা আছে। "চত্বারি পদজাতানি। নামাখ্যাতে চোপসর্গ-নিপাতাশ্চেতি।"

কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতের মত বৈদিক সাহিত্যে উপসর্গ সর্বদা ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে অবস্থান করে না। বেদের ভাষায়

(বিশেষতঃ ঋগ্বেদে) উপসর্গগুলিকে বহু সময়ে ধাতু হ'তে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রযুক্ত দেখা যায়। "ব্যবহিতাশ্চ" (সূত্র)। যেমন— উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে নমো ভরন্ত এমসি। লৌকিক সংস্কৃতে বলা হবে 'উপৈমসি'। এইরকম—"নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাত্"। "স দেবাঁ এহ (আ+ইহ) বক্ষতি।" "অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু"। "সং পূষন্ বিদুষা নয়।" ইত্যাদি।

কখনও কখনও উপসর্গগুলি ধাতুর পরেও ব্যবহৃত হয়। "ছন্দসি পরেঽপি" (সূ.)। যথা—"জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ।" "হরিভ্যাং যাহি-ওক্ আ।" ['আযাহি'-র পরিবর্তে "যাহি ...আ" এবং 'সংজয়েম'-স্থানে 'জয়েম সং'। এই জাতীয় অন্য উদাহরণ—"মা নো ঘোরেণ চরতাভি ধৃষ্ণু।" "গমদ্ বাজেভিঃ আ স নঃ।" ইত্যাদি।

অনেক সময়ে একটি বিশেষ উপসর্গের ব্যবহারের ফলেই তদুপযুক্ত ধাতুটির প্রয়োগ করা হ'য়েছে। যথা—দ্বিষো বি মৃধো জহি। এখানে 'বি' উপসর্গের ব্যবহৃত হ'য়েছে ব'লেই 'জহি' এই ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হ'ল।

কেবলমাত্র পাদপূরণের জন্য প্র, সম্, উপ এবং উত্ এই উপসর্গগুলির দ্বিরুক্তি হয়। "প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে" (সূ.)। যেমন— উপোপ মে পরামৃশ।" "প্র প্র বয়ম্ অমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্।" "সং সম্ ইদ্যুবসে।" "কিং নোদুদু হর্ষসে।" ইত্যাদি।

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের ব্যবহার সম্পর্কে আরও দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়। (১) প্রধানবাক্যের উপসর্গগুলি ধাতুর সংগে সমাসবদ্ধ নয় এবং তারা আদ্যুদাত্ত। যেমন "অগ্নিভিরগ্ন আ গহি।"

(২) কিন্তু অপ্রধান বাক্যগুলিতে উপসর্গগুলি ধাতুর সংগে সমাসবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং ধাতুর স্বর বজায় থাকে। যথা— "অগ্নে যং যজ্ঞম্ অধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূঃ অসি।" "যত্রা নরা দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রম্।" ইত্যাদি।

বৈদিক উপসর্গ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলার থাকে। বেদে এমন প্রয়োগ দেখা যায় যেখানে ক্রিয়া নেই অথচ উপসর্গ ব্যবহৃত হ'য়েছে; ক্রিয়ার অর্থ সেখানে ইঙ্গিতলভ্য। যেমন— "আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ স্নুতং পিব।" এখানে 'আ'— অর্থ 'আগচ্ছ।' [স্মরণীয় "উপসর্গযোগে যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ।"]

উপসর্গগুলি অনেক সময়ে বিশেষ বিশেষ বিভক্তির কারণ হয়। যেমন—"মর্যো ন যোষাম্ অভ্যেতি পশ্চাত্।" এখানে 'অভি' উপসর্গের ব্যবহারের ফলেই 'যোষাম্'-শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হ'য়েছে। এইরকম 'অধি'-যোগে সপ্তমীর উদাহরণ—"তেজো ময়ি ধারয়াধি।" 'উপ'-যোগে সপ্তমী, যথা—"অসূর্যা উপ সূর্যে।"

উপসর্গ এবং ধাতুর অতি পরিচিত প্রয়োগও ঋগ্বেদে বিরল নয়; অর্থাৎ ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত উপসর্গের প্রয়োগও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। যথা—"যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাম্।" "যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে"। "যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসঃ"। ইত্যাদি।

উপসর্গের এই বিচিত্র প্রয়োগ বৈদিক ভাষার ভাবপ্রকাশের বলিষ্ঠতার পক্ষে অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। উপসর্গের এই স্বাতন্ত্র্য বৈদিক ভাষার বহুমুখী বৈচিত্র্যের পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বেদে ক্রিয়ার অভিপ্রায় ভাব বা 'লেট্'-লকার (Vedic Subjunctive) :—বৈদিক ভাষায় 'লেট্' একটি বিশেষ ভাববোধক ল-কার যার প্রয়োগ ধ্রুপদী সংস্কৃতে একেবারেই নেই। এই ভাবটি সাধারণতঃ পণবন্ধ অর্থাৎ অভিপ্রায় বা চুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে Subjunctive নামে চিহ্নিত করা হ'য়েছে।

প্রধান বাক্যে লেট্-এর বাক্যগত প্রয়োগ দ্বিবিধ। (১) প্রশ্নবোধক বাক্যে ; যথা—কিমু নু বঃ কৃণবাম ?—আমরা তোমার জন্য কোন্ প্রার্থনা ক'রব ? (২) নেতিবোধক বাক্যে ; যথা—ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করঃ—তারা কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, কোন তস্কর তাদের ক্ষতি ক'রতে পারে না।

অপ্রধান বাক্যেও লেট্-এর প্রয়োগ হয়। যথা—"নেত্ জিহ্মায়ন্ত্যো নরকং পতাম"—যদি আমরা কুটিল পথ অনুসরণ ক'রি, তাহলে নরকে পতিত হব।

লেট্ বিবিধ অর্থের ভাববাহী। সম্ভাবক ভাব বা (১) বিধিলিঙ্-এর অর্থে লেট্ প্রযুক্ত হয়। "লিঙর্থে লেট্" (সূ.)। যেমন —"স দেবাঁ এহ বক্ষতি"। অন্য উদাহরণ—

—সং পূষন্ বিদুষা নয় যোহঞ্জসা-অনুশাসতি।

—গবাং গোপতির্নো ভবাতি।

—শৃতং যদা করোষি জাতবেদঃ।

—ও ষু ণো অগ্নে....দেবেভ্যো ব্রবসি যজ্ঞিয়েভ্যঃ।

—কুম্ভ্যাং মা অগ্রে বিভরাসি। (শতপথব্রাহ্মণ-মনুমৎস্যকথা)

(২) উপসংবাদ এবং আশঙ্কা প্রাপ্তির সম্ভাবনাতে লেট্ ব্যবহৃত হয়। "উপসংবাদাশংকয়োশ্চ" (সূ.)। 'উপসংবাদ'

অর্থ পণবন্ধ বা চুক্তি। যথা—"অহমেব পশূনাম্ ঈশৈ"। 'আশঙ্কা' শব্দের অর্থ কারণ হ'তে কার্য্যানুসারী তর্ক। যথা—"হোত্রাদ্ অহং বরুণ বিভ্যদায়ম্ নেদেব মা যুনজন্নত্র"। "নেত্ জিহ্মায়ন্ত্যো নরকং পতাম।" "অহমেব" ইত্যাদি বাক্যটি পরস্পর ভাগাভাগির সময়ে উক্ত চুক্তিবাক্য।

লেট্-এর বিভক্তিগুলি তিপ্-তস্-ঝি এবং তে-আতে-অন্তে ইত্যাদি। কিন্তু লেট্-এর রূপগঠনের পক্ষে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসৃত।

(১) পরস্মৈপদের বিভক্তির ই-কার লোপ পায়। "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু" (সূ.)। যথা 'তারিষত্'—"প্র ণ আয়ুংষি তারিষত্"। অশ্নবত্—"অগ্নিনা রয়িম্ অশ্নবত্।" আগমত্—"দেবো দেবেভিরাগমত্"। ইত্যাদি।

(২) লেট্-এ ধাতু এবং বিভক্তির মাঝে 'অট্' অথবা 'আট্' আগম হয়। "লেটোঽডাটৌ" (সূ.)। যথা—করত্, গমত্, করাতি, বিভরাসি, পতাতি, দভাতি ইত্যাদি।

(৩) কখনও কখনও সিপ্ আগম হয়। "সিব্ বহুলং লেটি"। সিপ্ আগম হ'লে ধাতুর স্বরের বৃদ্ধি ঘটে; যথা—√তৃ >তারিষত্।

(৪) উত্তম-পুরুষে '-বস্' এবং '-মস্' বিভক্তির স্-কার লোপ পায়। যথা—'করবাবঃ' না হ'য়ে 'করবাব' রূপ হয়। 'পতামঃ' স্থানে 'নরকং পতাম' এই রূপ পাই। এই প্রসঙ্গে পাণিনি-প্রণীত সূত্র—"স উত্তমস্য"।

(৫) আত্মনেপদী ধাতুর '-আতে' এবং 'আথে' বিভক্তিতে

আকার স্থানে ঐ-কার হয়। "আত ঐ" (সূ.)। যথা—"সুতেভিঃ সুপ্রয়সা মাদয়ৈতে।"

(৬) আত্মনেপদী বিভক্তির এ-কার স্থানে প্রায়শঃ ঐ-কার দেখা যায়। যেমন, ঈশৈ, অতিবধৈ, উপাসসৈ, আপত্যাসৈ ইত্যাদি।

উপসংহারে বলা যায় অভিপ্রায়-ভাব বা লেট্-এর অর্থগত তাৎপর্য অনুজ্ঞা বা লোট্-এর গুরুত্ব অপেক্ষা কম ; কিন্তু সম্ভাবকভাব বা লিঙ্-এর অর্থগত গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক জোরাল। লোট্ (Imperative), লেট্ (Subjunctive) এবং লিঙ্ (Optative)—এই তিনটি ল-কারের প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাক্রমে আদেশ বা অনুরোধ, প্রার্থনাপূরণ এবং ইচ্ছা।

নির্বন্ধভাব [Injunctive]

অভিপ্রায় ভাবের থেকে এর রূপগত পার্থক্য অত্যন্ত অল্প ; ফলে পৃথক্ ভাবে এর স্বরূপগত বিচার করা একটু কঠিন কাজ। গঠনগত দিক থেকে বিশ্লেষণ ক'রলে বলা যায়, আগমবিহীন অতীতকালের রূপগুলিকে নির্বন্ধ ভাবের রূপ নির্দেশ করা হ'য়েছে। ভাবগত বিচারে বলা যায় নির্বন্ধ ভাবের মধ্যে অভিপ্রায় (subjunctive), সম্ভাবক (optative) এবং অনুজ্ঞা (imperative)—এই তিনটি ভাব-মিশ্রিত ইচ্ছার অর্থ আছে।

(১) বক্তার ইচ্ছাধীন নির্বন্ধভাব—যেমন, ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্র বোচম্। অপরের ইচ্ছাধীন নির্বন্ধ—অগ্নিং হিন্বন্তু নো ধিয়ঃ, তেন জেষ্ম ধনং ধনম্। এই প্রয়োগ সাধারণতঃ উত্তমপুরুষে বেশী পরিলক্ষিত।

(২) মধ্যম-পুরুষে অধিকাংশ সময়ে অনুজ্ঞাযুক্ত ক্রিয়াপদের সহযোগে নির্বন্ধ ব্যবহৃত হয়। যেমন—সুগা নঃ সুপথা কৃণু, পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।

(৩) প্রথম পুরুষেও অনুজ্ঞার পাশাপাশি নির্বন্ধ ব্যবহৃত হয়। যেমন—সেমাং বেতু বষট্‌কৃতিম্, অগ্নির্ জুষত নো গিরঃ। অভিপ্রায়ের সংগে ব্যবহৃত নির্বন্ধ—উপ ব্রহ্মাণি শৃণব ইমা নো, অথা তে যজ্ঞস্তন্বে বায়ো ধাত্।

(৪) স্বতন্ত্র ভাবেও নির্বন্ধ ব্যবহৃত হ'ত। "ইমা হব্যা জুষন্ত নঃ"।

নেতিবাচক বাক্যে নির্বন্ধ রূপের পূর্বে 'মা' অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা "মা ন ইন্দ্র পরা বৃণক্"—হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের প্রতি বিমুখ হ'য়ো না। "মা তন্তুশ্ছেদি"—তন্তু (সন্তানধারা) যেন ছিন্ন না হয়। নেতিবাচক বাক্যে 'ন' অব্যয়ের সংগেও নির্বন্ধ ব্যবহৃত হয়। যথা "যম্ আদিত্যা অভি দ্রুহো রক্ষথা, নেম্ অঘং নশত্।

প্রশ্নবোধক বাক্যেও নির্বন্ধ ভাব বেদে প্রায়ই ব্যবহৃত হ'য়েছে। —কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাত্? কদা নঃ শুশ্রবদ্ গিরঃ? ইত্যাদি।

এই বিশিষ্ট ভাব বৈদিক সংহিতাভাগেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে ইতিবাচক বাক্যে নির্বন্ধের ব্যবহার প্রায় লুপ্ত হ'য়ে গেছে; কিন্তু নেতিবাচক বাক্যসমূহে 'মা' অব্যয়ের সংগে এর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। অভিপ্রায় এবং অনুজ্ঞার সংগে এর পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে নেতিবাচক বাক্যে প্রয়োগের উদাহরণ—"মা বিভীত", "মা বধধ্বম্", 'মা সুষুপ্থাঃ" ইত্যাদি।

বৈদিক অসমাপিকা (Vedic Infinitives) ঃ—

লৌকিক সংস্কৃতে অসমাপিকা বোধক প্রত্যয় তুমুন্-এর অনেক-গুলি বৈদিক বৈকল্পিক রূপ আছে। চিরায়ত সংস্কৃতের 'সর্ত্তুম্' পদের 'সর্ত্তবে, সর্ত্তোঃ ইত্যাদি বহু বৈদিক রূপ দেখা যায়। পাশ্চাত্য বৈয়াকরণেরা 'তু' এই অংশটিকে মাত্র অসমাপিকাবোধক উপাদান-রূপে স্বীকার ক'রেছেন। তারপরে নবনির্মিত প্রাত্যয়িক শব্দটির বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। দ্বিতীয়াতে 'সর্ত্তুম্' চতুর্থীতে 'সর্তবে', পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে 'সর্তোঃ' ইত্যাদি (তুলনীয় সাধু > সাধুম্, সাধবে, সাধোঃ)। এই ভাবে তাঁরা বৈদিক অসমা-পিকাকে দ্বিতীয়াত্মক (accusative), চতুর্থীযুক্ত (dative) এবং অপাদানাত্মক (ablative), ষষ্ঠীযুক্ত (genetive)—এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির 'infinitive' নামে চিহ্নিত ক'রেছেন।

আচার্য পাণিনি বৈদিক অসমাপিকা রূপের বহুল বৈচিত্র্যকে নিম্নলিখিত সূত্রগুলির মাধ্যমে গ্রথিত ক'রেছেন—

(১) তুমর্থে সে-সেন্-অসে-অসেন্-ক্সে-ক্সেন্-অধ্যৈ-অধ্যৈন্-কধ্যৈ-কধ্যৈন্-তবৈ-তবেঙ্-তবেনঃ।

(২) শকি ণমুল্-কমুলৌ।

(৩) দৃশে বিখ্যে চ।

(৪) ঈশ্বরে তোসুন্ কসুনৌ।

(ক) তুমর্থে অসমাপিকা অথবা dative infinitive—যেমন—চক্ষসে=দেখার জন্য, চরসে=বেড়াবার জন্য, পীতয়ে=পান করার জন্য, অত্তবে=ভোজন করার জন্য, এতবৈ=গমন করার জন্য,

গন্তবৈ, হন্তবৈ=হত্যা করার জন্য, গমধ্যৈ=গমন করার জন্য, ত্রামণে=রক্ষা করার জন্য।

ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ (দেবীসূক্ত) [লৌকিকে 'হন্তুম্' পদ সিদ্ধ] তুলনীয় 'উত্তররামচরিত' নাটকে কিছুটা অপ্রচলিত প্রাচীন প্রয়োগ—"রে হস্তদক্ষিণ, মৃতস্য শিশোর্জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্।"

(খ) তুমুন্, ণমুল্, কমুল্ অর্থাৎ accusative infinitive—যেমন—দাতুম্, কর্তুম্ ইত্যাদি।

ণমুল্—বিভাজম্ নাশকত্। [লৌকিকে 'বিভক্তুম্' রূপ হয়।]

কমুল্—সমিধম্, সংপৃচ্ছম্ (প্রজ্বলিত করার জন্য, জিজ্ঞাসা করার জন্য।)

অপলুপং নাশকত্। (লুপ্ত ক'রতে পারেনি। লৌকিকে অপলোপ্তুম্ পদ সিদ্ধ)

[এছাড়া আছে দৃশে, বিখ্যে পদদ্বয়; অর্থ 'দ্রষ্টুম্', 'বিখ্যাতুম্'।]

(গ) তোসুন্-কসুন্ বা ablative infinitive/genetive infinitive—যেমন—আতৃদঃ=বিদ্ধ হ'য়ে, এতোঃ/গন্তোঃ=গমন ক'রে। তুলনীয়, "মধ্যা কর্তোঃ বিততং সংজভার"।—সূর্যসূক্ত (১-১১৫)

(ঘ) অধিকরণাত্মক বা locative infinitive-ও স্বীকৃত হ'য়েছে। উদাহরণ—সঞ্চক্ষি, ধর্তবি, নেষণি, দৃশি ইত্যাদি।

এই জাতীয় রূপ বেদেও স্বল্প পরিমাণেই ব্যবহৃত।

অতীতদ্যোতক অসমাপিকা [Vedic gerund]:—

এই প্রত্যয়গুলি সমাপিকা ক্রিয়ার সংগে সহানুষ্ঠিত অথবা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশের মাধ্যম। ধাতুর

বৈদিক অসমাপিকা (Vedic Infinitives) ঃ—

লৌকিক সংস্কৃতে অসমাপিকা বোধক প্রত্যয় তুমুন্-এর অনেক-গুলি বৈদিক বৈকল্পিক রূপ আছে। চিরায়ত সংস্কৃতের 'সর্ত্তুম্' পদের 'সর্ত্তবে, সর্ত্তোঃ ইত্যাদি বহু বৈদিক রূপ দেখা যায়। পাশ্চাত্য বৈয়াকরণেরা 'তু' এই অংশটিকে মাত্র অসমাপিকাবোধক উপাদান-রূপে স্বীকার ক'রেছেন। তারপরে নবনির্মিত প্রাত্যয়িক শব্দটির বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। দ্বিতীয়াতে 'সর্ত্তুম্' চতুর্থীতে 'সর্তবে', পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে 'সর্তোঃ' ইত্যাদি (তুলনীয় সাধু > সাধুম্, সাধবে, সাধোঃ)। এই ভাবে তাঁরা বৈদিক অসমা-পিকাকে দ্বিতীয়াত্মক (accusative), চতুর্থীযুক্ত (dative) এবং অপাদানাত্মক (ablative), ষষ্ঠীযুক্ত (genetive)—এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির 'infinitive' নামে চিহ্নিত ক'রেছেন।

আচার্য পাণিনি বৈদিক অসমাপিকা রূপের বহুল বৈচিত্র্যকে নিম্নলিখিত সূত্রগুলির মাধ্যমে গ্রথিত ক'রেছেন—

(১) তুমর্থে সে-সেন্-অসে-অসেন্-কৃসে-কৃসেন্-অধ্যৈ-অধ্যৈন্-কধ্যৈ-কধ্যৈন্-তবৈ-তবেঙ্-তবেনঃ।

(২) শকি ণমুল্-কমুলৌ।

(৩) দৃশে বিখ্যে চ।

(৪) ঈশ্বরে তোসুন্ কসুনৌ।

(ক) তুমর্থে অসমাপিকা অথবা dative infinitive—যেমন—চক্ষসে = দেখার জন্য, চরসে = বেড়াবার জন্য, পীতয়ে = পান করার জন্য, অত্তবে = ভোজন করার জন্য, এতবৈ = গমন করার জন্য,

গন্তবৈ, হন্তবৈ=হত্যা করার জন্য, গমধ্যৈ=গমন করার জন্য, ত্রামণে=রক্ষা করার জন্য।

ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ (দেবীসূক্ত) [লৌকিকে 'হন্তুম্' পদ সিদ্ধ] তুলনীয় 'উত্তররামচরিত' নাটকে কিছুটা অপ্রচলিত প্রাচীন প্রয়োগ—"রে হস্তদক্ষিণ, মৃতস্য শিশোর্জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্।"

(খ) তুমুন্, ণমুল্, কমুল্ অর্থাৎ accusative infinitive—যেমন—দাতুম্, কর্তুম্ ইত্যাদি।

ণমুল্—বিভাজম্ নাশকত্। [লৌকিকে 'বিভক্তুম্' রূপ হয়।]

কমুল্—সমিধম্, সংপৃচ্ছম্ (প্রজ্বলিত করার জন্য, জিজ্ঞাসা করার জন্য।)

অপলুপং নাশকত্। (লুপ্ত ক'রতে পারেনি। লৌকিকে অপলোপ্তুম্ পদ সিদ্ধ)

[এছাড়া আছে দৃশে, বিখ্যে পদদ্বয়; অর্থ 'দ্রষ্টুম্', 'বিখ্যাতুম্'।]

(গ) তোসুন্-কসুন্ বা ablative infinitive/genetive infinitive—যেমন—আতৃদঃ=বিদ্ধ হ'য়ে, এতোঃ/গন্তোঃ=গমন ক'রে। তুলনীয়, "মধ্যা কর্তোঃ বিততং সংজভার"।—সূর্যসূক্ত (১-১১৫)

(ঘ) অধিকরণাত্মক বা locative infinitive-ও স্বীকৃত হ'য়েছে। উদাহরণ—সঞ্চক্ষি, ধর্ত্তবি, নেষণি, দৃশি ইত্যাদি।

এই জাতীয় রূপ বেদেও স্বল্প পরিমাণেই ব্যবহৃত।

অতীতদ্যোতক অসমাপিকা [Vedic gerund]:—

এই প্রত্যয়গুলি সমাপিকা ক্রিয়ার সংগে সহানুষ্ঠিত অথবা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশের মাধ্যম। ধাতুর

সংগে (লৌকিক সংস্কৃতে) 'ত্বা' (< ক্ত্বাচ্) প্রত্যয় যুক্ত ক'রে সাধারণতঃ এই প্রাত্যয়িক রূপ গঠিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে 'ত্বী' এবং 'ত্বায়' এই দুটি অতিরিক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। ফলে 'কৃত্বা', 'গত্বা' ইত্যাদির পাশাপাশি 'কৃত্বী', 'ভূত্বী' ইত্যাদি প্রয়োগ পাওয়া যায়।

পাণিনির সূত্রগুলিকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি প্রথমেই ব'লেছেন "ক্ত্বো যক্"। এর দ্বারা 'গত্বায়', 'হত্বায়' ইত্যাদি পদে নিয়মিত 'ত্বা' উপাদানের পরে 'য'-উপাদান সিদ্ধ হ'চ্ছে। তুলনীয় পদ "কৃত্বায়', 'বৃত্বায়', 'হিত্বায়' ইত্যাদি। স্মরণীয় "হিত্বায় অবদ্যং পুনরস্তম্ এহি"। (অক্ষসূক্ত ১০।৩৪)

পরবর্তী সূত্র "ইষ্ট্বীনম্ ইতি চ"। 'ইষ্ট্বা'-র পরিবর্তে বেদে 'ইষ্ট্বীনম্' পদ সিদ্ধ। পরবর্তী সূত্র "স্নাত্ব্যাদয়শ্চ"। এই সূত্রের দ্বারা 'ত্বী'-প্রত্যয়ান্ত পদগুলি ব্যাখ্যাত হ'চ্ছে। ফলে 'স্নাত্বা'-র পরিবর্তে 'স্নাত্বী', 'পীত্বা'-র স্থলে 'পীত্বী', এবং 'কৃত্বী', 'হিত্বী' ইত্যাদি রূপ গঠিত দেখা যায়। "পীত্বী সোমস্য বাবৃধে", "খিন্নঃ স্নাত্বী মলাদিব" ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যয়টি ল্যপ্ (> য) হয়। এবং হ্রস্ব স্বরান্ত ধাতুর ক্ষেত্রে ধাতু ও প্রত্যয়ের মাঝে 'ত্'-আগম ঘটে ("হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্"।) পাশ্চাত্য বৈয়াকরণের ভাষায় '-য' এবং '-ত্য' দুটি প্রত্যয় ব্যবহৃত। উদাহরণ অভ্যুপ্য, অভিক্রম্য, সম্ভুয়, প্রাপ্য, বিভজ্য, অনুদৃশ্য ইত্যাদি এবং নমস্কৃত্য, অপমিত্য ইত্যাদি। সংহিতাদীর্ঘের ফলে আকারান্ত রূপও কখনও পাওয়া যায়। উদাহরণ—এত্যা, আদৃত্যা, বিহত্যা, আগত্যা ইত্যাদি।

এছাড়াও স্বল্পদৃষ্ট পুনর্দায়, মিথস্পৃধ্য, হস্তগৃহ্য, কর্ণগৃহ্য ইত্যাদি পদ বেদে পাওয়া যায়।

অসমাপিকার মত এই প্রাত্যয়িক রূপেরও অসংখ্য বৈচিত্র্য ঋগ্বেদে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য [Vedic Declension] :—

বৈদিক সংহিতাভাগে শব্দরূপের কাঠামো পরবর্তী কালের সংস্কৃতের সংগে মোটামুটী সাধর্ম্য বজায় রাখলেও তার নিজস্ব কয়েকটি বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়।

(১) অকারান্ত শব্দের প্রথমা-বহুবচনে 'অস্' বিভক্তির পরিবর্তে 'আসঃ' বিভক্তির রূপ প্রায়ই দেখা যায়। বস্তুতঃপক্ষে একবার '-অস্' (< জস্) বিভক্তি যোগ হবার পরে আবার 'অসুক্' বিভক্তি যুক্ত হবার ফলেই এই পরিণতি ঘটে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :—

নর + অস্ = নরাস্ (> নরাঃ, লৌকিকে দৃষ্ট) > নরাস্ + অস্ = নরাসঃ। পাণিনিসূত্র—"আজ্‌জসেরসুক্"। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ—"বিশ্বে দেবাসো অক্রুহঃ", "দিবি দেবাস আসতে", "যস্য-অশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ", "অহস্তাসো হস্ত-বন্তং সহন্তে" ইত্যাদি।

(২) ক্লীবলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের দ্বিতীয়া বহুবচনে 'আ' বিভক্তি লক্ষ্যণীয়। [সূ. "শেশ্ছন্দসি বহুলম্"] "সর্বা তা যম আহিতা"। লৌকিকে "সর্বাণি তানি······আহিতানি" হবে। তুলনীয় উদাহরণ—"ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা"।

(৩) অকারান্ত শব্দের তৃতীয়া বহুবচনে লৌকিক সংস্কৃতে 'ভিস্' স্থানে 'ঐঃ' বিভক্তি যুক্ত হয়, ফলে নরৈঃ, দেবৈঃ ইত্যাদি পদ

গঠিত হয়। কিন্তু বেদে অকারান্ত শব্দের উত্তরও 'ভিঃ' বিভক্তি হয়। উদাহরণ—"অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত"; "দেবো দেবেভিরাগমত্", "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্ আদিত্যৈঃ", জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ" ইত্যাদি।

(৪) পুংলিঙ্গ ই-কারান্ত এবং উকারান্ত শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার -'অম্', এবং পঞ্চমী-ষষ্ঠীর -'অস্'-বিভক্তি অনেক সময়ে সোজাসুজি যুক্ত হয়। ফলে সন্ধি-প্রক্রিয়া, সাধন ক'রে অরি + অম্ = অর্যম্ (অরিম্ নয়), অরি + অস্ = অর্যঃ (অরেঃ নয়) ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে "যো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবা মিনাতি", "বিষ্ণোঃ পরমে পদে মধ্ব উত্সঃ" ইত্যাদি প্রয়োগের উল্লেখ করা যায়।

(৫) স্ত্রীলিঙ্গ ঈ-কারান্ত এবং উ-কারান্ত শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় 'যম্' এবং 'বম্' বিভক্তিযুক্ত রূপ দেখা যায়। উদাহরণ—"যাবয়া বৃক্যং বৃকম্" [বৃকী + অম্ = বৃক্যম্, 'বৃকীম্' হবে লৌকিক সংস্কৃতে], "আবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্" ('তনূম্' হয়নি)।

(৬) 'রাত্রী'—শব্দ বেদে সর্বদা দীর্ঘ ঈকারান্তরূপেই পঠিত। (পা. সূ. "রাত্রেশ্চাজসৌ")। "ঔচ্ছত্ সা রাত্রী", "আদ্ রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ"।

(৭) স্ত্রীলিঙ্গ ঈ-কারান্ত শব্দ এবং 'অপ্' শব্দের দ্বিতীয়া বহুবচনের রূপের সংগে প্রথমা বহুবচনের রূপের পার্থক্য অনেক সময়ে রক্ষিত হয় না। ফলে "আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বম্ আয়ন্" এই বাক্যে কর্তৃবাচী 'অপ্' শব্দের বিশেষণ 'বৃহতী' শব্দের রূপটি

প্রথমান্ত না হ'য়ে দ্বিতীয়ার সদৃশ হ'য়েছে। "যশ্চিদ্ আপো মহিনা পর্যপশ্যত্"—এই বাক্যে 'অপ্' কর্ম, সুতরাং দ্বিতীয়া প্রয়োজ্য, কিন্তু প্রথমান্ত 'আপঃ' পদই প্রযুক্ত হ'য়েছে। তুলনীয় অপর উদাহরণ—"যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জ্জান"।

(৮) শ্রী-শব্দের ষষ্ঠী বহুবচনে 'শ্রিয়াম্'-এর পরিবর্তে 'শ্রীণাম্' পদ দেখা যায়। "শ্রীণাম্ উদারো ধরুণো রযীণাম্"।

(৯) মন্ত্রে পাদান্তস্থিত গো-শব্দের ষষ্ঠী বহুবচনে 'গবাম্'-এর পরিবর্তে 'গোনাম্' পদ বিকল্পে সিদ্ধ। "বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনাম্।" কিন্তু "গবাং শাতা পৃক্ষয়ামেষু"। পাদান্তেও বিকল্পে 'গবাম্' পদ হয়। যেমন—বিরাজং গোপতিং গবাম্।

(১০) অন্-ভাগান্ত শব্দের দ্বিতীয়া একবচনে 'আনম্'-বিভক্তিযুক্ত পদ সাধারণতঃ লৌকিক সংস্কৃতে গঠিত হয়। যেমন বৃত্রহন্>বৃত্রহাণম্। কিন্তু বৈদিক সংহিতাভাগে অনেক সময়ে প্রাতিপদিকের স্বরবৃদ্ধি ঘটে না। ফলে 'পূষন্'-শব্দের দ্বিতীয়া একবচনে 'পূষাণন্'-স্থানে 'পূষণম্' পদ দৃষ্ট হয়। "শৃণ্বন্তং পূষণং বয়ম্।"

(১১) 'পথিন্' শব্দের প্রাতিপদিকটি বেদে সম্ভবতঃ 'পন্থ' বা 'পন্থা' রূপে গৃহীত ছিল। ফলে দ্বিতীয়াতে লৌকিকের পরিচিত 'পন্থানম্' পদের পরিবর্তে 'পন্থাম্' পদ গঠিত। "বহুভ্যঃ পন্থাম্ অনুপস্পশানম্"।

(১২) 'শিরস্' শব্দ বেদে 'শীর্ষন্'-রূপে পঠিত। "শীর্ষ্ণঃ শীর্ষ্ণো জগতঃ"।

(১৩) 'সুমেধস্' শব্দের দ্বিতীয়া-একবচনে 'সুমেধসম্' হয় না; 'সুমেধাম্' পদই বেশী ব্যবহৃত হয়। "তং ব্রহ্মাণম্ তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্"।

(১৪) মতুপ্-প্রত্যয়ান্ত এবং 'বস্'-ভাগান্ত শব্দের সম্বোধন-একবচনে বিসর্গযুক্ত পদ গঠিত হয়। "যক্ষি চিকিত্ব আনুষক্ (পা. সূ. "মতুবসো রু সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি)।

(১৫) 'অহন্'-শব্দের তৃতীয়া বহুবচনে 'অহোভিঃ'-র পরিবর্তে 'অহভিঃ' পদ বেদে সিদ্ধ ("ঈর্মা তস্থুষীরহভিঃ দুদুহ্রে।" 'অহোভিঃ' পদের প্রয়োগও দেখা যায়—"অহোভিঃ অদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তুম্"।

(১৬) 'ইদম্'-শব্দের তৃতীয়া একবচনে 'অনেন'-স্থলে 'অয়া' পদ বেদে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এনা পদও ব্যবহৃত হয়। "অয়া তে অগ্নে বিধেম উর্জো নপাদ্ অশ্বমিষ্টে। এনা সূক্তেন সুজাত॥"

(১৭) বৈদিক শব্দরূপের গঠন প্রকৃতি বিচার প্রসঙ্গে পাণিনির একটি দীর্ঘ সূত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক তাৎপর্যবাহী।—"সুপাং সু-লুক্-পূর্বসবর্ণ-আত্-শে-যাডাড্যাযাজালঃ।" অর্থাৎ বেদে সুপ্-বিভক্তিসমূহের পরিবর্তে (ক) সু (প্রথমা একবচন), (খ) বিভক্তি লোপ, (গ) পূর্বসবর্ণদীর্ঘ, (ঘ) আত্-প্রত্যয়, (ঙ) শে-প্রত্যয়, (চ) যা-প্রত্যয়, (ছ) ডা-প্রত্যয়, (জ) ড্যা-প্রত্যয়, (ঝ) যাচ্-প্রত্যয়, এবং (ঞ) আল্-প্রত্যয়—সবই হ'তে পারে। যথাক্রমে উদাহরণ—

(ক) ঋজবঃ সন্তু পন্থাঃ। (পথিন্ শব্দে বহুবচনের 'জস্'-স্থলে প্রথমা একবচন)।

(খ) যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্। ('ব্যোম্নি' ; বিভক্তি লুপ্ত ; ব্যোমন্) অহং দধামি পিতরম্ অস্য মূর্ধন্। (মূর্ধ্নি—৭মী হয় নি, লুপ্ত)

(গ) "যঃ সুব্রতম্ অবতি যঃ পচন্তং যঃ শংসন্তং যঃ শশমানম্ ঊতী।" (উতি শব্দের তৃতীয়া-একবচনে উত্যা হয়নি, পূর্বসবর্ণদীর্ঘ ক'রে 'ঊতী')।

(ঘ) "অহং মিত্রাবরুণা বিভর্মি-অহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বি-নোভা"। ('মিত্রাবরুণৌ', 'অশ্বিনৌ' হয়নি ; ঔ-বিভক্তি স্থানে 'আ' ব্যবহৃত)। "উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা।" (উভৌ রাজানৌ=লৌকিক প্রয়োগ)।

(ঙ) "ন যুষ্মে বাজবন্ধবঃ", অস্মে ইন্দ্রাবৃহস্পতী"। ('যুষ্মাসু', 'অস্মভ্যম্' ইত্যাদি স্থলে 'শে' প্রযুক্ত)।

(চ) যা-প্রত্যয়ের প্রয়োগে 'উরুণা', 'ধৃষ্ণুণা' ইত্যাদির পরিবর্তে বেদে 'উরুয়া', 'ধৃষ্ণুয়া' ইত্যাদি পদ গঠিত হয়।

(ছ) নাভা পৃথিব্যাঃ। (নাভি+৭মী একবচন=নাভৌ, ডা-প্রত্যয় যুক্ত হ'য়েছে, ফলে 'নাভা' সিদ্ধ)।

(জ) ড্যা—অনুষ্ঠানম্ অনুষ্ঠা।

(ঝ) 'সাধুয়া' পদ বেদে 'সাধু+যাচ্' প্রক্রিয়াতে সিদ্ধ হয়।

(ঞ) বসন্তা যজেত। ('বসন্তে'—এই সপ্তমী একবচনের পরিবর্তে আল্-প্রত্যয় যোগ ক'রে 'বসন্তা' পদ)।

(১৮) 'মহিমন্'—শব্দের তৃতীয়া-একবচনে 'মহিনা' পদ বেদে

খুব বেশী দেখা যায়।—"যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যত্", "এতাবতী মহিনা সংবভূব"। লৌকিক সংস্কৃতে 'মহিম্না' পদ শুদ্ধ ব'লে বিবেচিত।

Ref. ভট্টোজী দীক্ষিত সিদ্ধান্তকৌমুদী (বৈদিক প্রকরণ)
W. D. Whitney The Sanskrit Grammar.
A. A. Macdonell A Vedic Grammar
K. C. Chatterjee Vedic Selections.

পরিশিষ্ট

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী ও উত্তরনির্দেশিকা

1966

(a) Discuss the affinity of Indo-European languages.

"ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক..." অধ্যায়ের ১২৭-১৩১ পৃঃ পর্যন্ত। [সংস্কৃতের ধ্বনি-বিবর্তনের তালিকার পূর্ব পর্যন্ত লিখতে হবে।]

(b) Comment on the rôle of analogy in linguistic change.

পৃঃ ৯০-৯২-তে 'সাদৃশ্য' দেখ।

(c) Write a short note on the characteristics of Vedic and Classical Sanskrit.

'বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিশদ পর্যালোচনা' অধ্যায়টির ৬৫ পৃঃ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য। রামায়ণ মহাভারতের কথা লিখতে হবে না।

(d) Determine the extent of non-Aryan influence on Sanskrit.

'সংস্কৃতের উপর আর্যেতর ভাষাসমূহের প্রভাব' অধ্যায়ের ঐ নামাঙ্কিত অংশটি দ্রষ্টব্য। 'মূর্দ্ধন্য বর্গের উৎস' লিখতে হবে না।

(e) What is a phonetic law? Give your answer with illustrations.

পৃঃ ১:৮ দ্রষ্টব্য। তার পরে যে কোন একটি ধ্বনিসূত্রের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

1967

(a) The rôle of Sanskrit in the evolution of comparative philology as a science.

'ভাষাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সংস্কৃতের ভূমিকা' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

(b) The principles underlying the classification of languages into families.

'ভাষার শ্রেণীবিভাগ' অধ্যায়টির পরিবেশন প্রয়োজন।

(c) The law of cerebralisation in Sanskrit and the supposed influence of alien languages on it.

'সংস্কৃতের উপর আর্যেতর ভাষাসমূহের প্রভাব' অধ্যায়ের 'সংস্কৃত ভাষার মূর্দ্ধন্যবর্গের উৎস' অংশটি লিখতে হবে। দ্রঃ পৃঃ ৮৯।

(d) Write a clear note on Non-Aryan influence on Sanskrit with illustrations.

'সংস্কৃতের উপর আর্যেতর ভাষাসমূহের প্রভাব' অধ্যায়ের ঐ অংশটুকু লিখতে হবে। 'মূর্দ্ধন্য বর্গের উৎস' লিখতে হবে না।

(e) Comment critically on the declension of the noun in Vedic and Classical Sanskrit.

পৃঃ ৬১ এবং ১৪৭ দ্রষ্টব্য।

(f) Write a note on the affinities between Sanskrit and Avesta.

'আবেস্তা ও বেদ' অধ্যায়টি সমগ্র লেখনীয়।

1968

(a) Elucidate with illustrations the affinities between Sanskrit and other IE languages.

'ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর' অধ্যায়ের 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য'-র বৈশিষ্ট্যগুলির সংগে (পৃঃ ৫০-৫২) ৯৩-৯৫ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুকে মিলিয়ে লিখতে হবে।

(b) **Write an informative note on phonetic law with appropriate illustrations.**

1966-এর Q. (e) দেখ।

(c) **Comment on the principal differences between Vedic and Classical Sanskrit.**

'বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিশদ পর্যালোচনা' অধ্যায়ে এই বিষয় আলোচিত হ'য়েছে। [পৃঃ ৫৮-৬৫] রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের আগে পর্যন্ত লিখতে হবে।

(d) **Describe the characteristic features of centum and Satəm groups of languages and mention their names.**

২২ পৃষ্ঠায় "ই-ইউ. ভাষাতে দুটি প্রাথমিক উপভাষাগত বিভাগ ছিল" থেকে কেলতিক ইত্যাদির বিবরণে আগে পর্যন্ত ; কেন্তম্ ও শতম্ গুচ্ছের ভাষাগুলির নামগুলি স্পষ্টভাবে লিখে দেওয়া প্রয়োজন।

(e) **What do you understand by families of languages ? What is the basis of such classification ? Discuss.**

'ভাষার শ্রেণীবিভাগ' অধ্যায় দেখ।

1969

(a) **Elucidate the affinities between Vedic-Sanskrit and Avesta.**

'আবেস্তা ও বেদ' অধ্যায় দেখ।

(b) **Write an explanatory note on Grimm's Law and Verner's Law.**

পৃঃ ১২০-১২২-তে গ্রিমের সূত্র, ভের্নার্-এর সূত্র দেখ।

(c) Trace the history of the evolution of Comparative Philology as a science.

'ভাষাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সংস্কৃতের ভূমিকা' অধ্যায় দেখ।

(d) Write a note on the influence of the Dravidian languages on Sanskrit.

'সংস্কৃতের উপর আর্যেতর ভাষাসমূহের প্রভাব' অধ্যায়ের প্রথম থেকে 'কাসর, লুলায়, সৈরিভ, হেরম্ব' পর্যন্ত লিখে ৮৭-৮৯ পৃঃ সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে দ্রাবিড়······দিগন্তের উন্মোচন করবে পর্যন্ত।

(e) Show your acquaintance with some of the peculiarities of classical Sanskrit with special reference to the Rāmāyaṇa and the Mahābhārata.

'বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিশদ পর্যালোচনা' অধ্যায়ের ইতিহাস পুরাণ ও রামায়ণের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অংশটুকু লিখতে হবে (পৃঃ ৬৫-৬৯); তার আগে সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্যগুলি বেছে নিয়ে সংক্ষেপে লিখতে হবে।

1970

(a) Discuss the non-Aryan influence in Sanskrit language.

1966/1967-এর Q. (d) দ্রষ্টব্য।

(b) Give a brief account of IE languages with special reference to their affinities with Sanskrit.

'ই-ইউ. ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিভাগ' অধ্যায়ে ১০টি ভাষার প্রত্যেকটির শেষাংশে যে বিশ্লেষণ দেওয়া আছে, সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্যের সংগে সেগুলিকে তুলনা করে লিখতে হবে। তার পূর্বে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

(c) **Describe the important features of the Vedic Sanskrit.**

বৈ. ও সং. ভাষার বিশদ পর্যালোচনা অধ্যায়ের ৫৮-৬৫ পৃষ্ঠা থেকে বৈদিক বৈশিষ্ট্যগুলি বেছে নিতে হবে।

(d) **Write a short essay on Sanskrit as a spoken language.**

'কথ্য সংস্কৃত' অধ্যায় লেখনীয়।

(e) **Discuss the importance of Comparative Philology.**

'ভাষাবিজ্ঞান কী? তার বিষয় এবং উদ্দেশ্য'—অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে আরম্ভ ক'রে Whitney-র উদ্ধৃতি পর্যন্ত লিখতে হবে।

1971

(a) **Show the Principal points of difference between the Vedic and Classical Sanskrit.**

1966/1968-এর Q (c) দেখ

(b) **Write a note on the influence of the Dravidian languages in Sanskrit.**

1966-এর Q (d) দ্রষ্টব্য।

(c) **Discuss the affinities of the IE languages.**

1966-এর Q (a) দ্রষ্টব্য।

(d) **What is a phonetic law? Give your answer with illustrations.**

1966-এর Q (e), 1968-এর Q (b) দেখ।

(e) **Write a note on 'Gender' in Sanskrit.**

উত্তর—সংস্কৃতে লিঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ভাষায় লিঙ্গ আভিধানিক এবং অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। পুং, স্ত্রী এবং ক্লীবভেদে সংস্কৃতভাষায় তিন প্রকার লিঙ্গ স্বীকৃত। আভিধানিক হওয়ার কারণে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ যে পুংত্ব এবং স্ত্রীত্ব জাতিবাচক তা' নয়।

(১) সংস্কৃতভাষাতে দেব, অসুর, স্বর্গ, যজ্ঞ, পর্বত, মেঘ, বৃক্ষ, সমুদ্র, সময়, অসি, শক্র, বাণ, গণ্ড, ওষ্ঠ, স্তন, কণ্ঠ, কেশ, নখ, দন্ত এবং হস্ত বাচক শব্দসমূহ পুংলিঙ্গ। এছাড়া ঘঞ্ এবং 'অল্-প্রত্যয়ান্ত এবং 'কি' প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গ। 'ইমনিচ্' প্রত্যয়ান্ত (মহিমা, লঘিমা) শব্দসমূহও পুংলিঙ্গ। উপধায় ট্-যুক্ত ঘট পট, ণ-যুক্ত গুণ, গণ, পাষাণ, প্-যুক্ত দ্বীপ, সর্প, ভ্-যুক্ত, কুম্ভ, স্তম্ভ, এবং র্-যুক্ত অঙ্কুর খুর প্রভৃতি শব্দ সর্বদা পুংলিঙ্গ। ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে ক্লীবলিঙ্গ ঋণ, লবণ, উপধায় ন্-যুক্ত তুহিন, কানন, মিথুন (যদিও ফেন, নন্দন পুংলিঙ্গ), শিল্প, পুষ্প, শষ্প ইত্যাদি শব্দ। দার, অক্ষত, লাজ, অসু-শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ-বহুবচনান্ত।

(২) ক্তিন্ এবং তল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহ সদা স্ত্রীলিঙ্গ; মতি, ধৃতি, জনতা, বন্ধুতা। ঋকারান্ত মাতৃ-দুহিতৃ-স্বসৃ-যাতৃ-ননান্দৃ শব্দসকল স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রীত্ব-বোধক ঙীপ্, ঙীষ্, টাপ্, ঊঙ্ ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠন করা যায়। 'বিংশতি' থেকে 'নবতি' (৯০) পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দসমূহ স্ত্রীলিঙ্গ। অমরকোষের মত অনুসারে ভূমি-বিদ্যুত্-লতা-সরিত্-বনিতা-নিশা-বল্লী-বীণা-দিক্-স্ত্রী শব্দসমূহ ও এদের সমার্থক শব্দসমূহ সদা স্ত্রীলিঙ্গ। এ'ছাড়া আপদ্, বিপদ্, সম্পদ্, স্বর্গবাচি 'দিব্', সংবিদ্ (=জ্ঞান), ক্ষুধ্, যুধ্ ও সমিধ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ত্বচ্, বাচ্, স্রজ্, গির্, পুর্ ও আশিস্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। অপ্-সুমনস্-সমা-সিকতা ও বর্ষা শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ-বহুবচনান্ত।

(৩) ভাববাচ্যে বিহিত 'ল্যুট্' (>অনট্) ও 'ক্ত'প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমূহ ক্লীবলিঙ্গ; করণম্, জ্ঞানম্, গতম্, গীতম্। ভাবার্থে 'ত্ব' ও 'ষ্যঞ্' এই তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; জড়ত্বম্, পাণ্ডিত্যম্ ইত্যাদি। ভাবার্থে অন্ প্রত্যয়ান্ত গৌরব, লাঘব প্রভৃতি শব্দও ক্লীবলিঙ্গ। সংখ্যাবাচক শতাদি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; শতম্, সহস্রম্। যশস্, মনস্, ছত্র, কলত্র, বন্ধু অর্থে মিত্র, ফলজাতীয় আম্র প্রভৃতি শব্দ সদা ক্লীবলিঙ্গ। এ'ছাড়া অরণ্য, পত্র, পর্ণ, হিম, উদক, শীত, উষ্ণ, মুখ, রক্ত, চক্ষু, লৌহ, ফল, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি শব্দ এবং অধিকাংশ সমার্থক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। স্বর্ণ, সুবর্ণ শব্দ পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ উভয়ই হয়।

সংস্কৃতে বিশেষ্য ও বিশেষণের লিঙ্গের সমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

বলা হ'য়েছে—"বিশেষ্যস্য হি যল্লিঙ্গং বিভক্তিবচনে চ যে।
তানি সর্বানি যোজ্যানি বিশেষণপদেষ্বপি॥

কিন্তু— "উদ্দেশ্যে চ বিধেয়ে চ বিভক্তিস্তু সমা ভবেত্।
কদাচিজ্জায়তে তত্র বৈষম্যং লিঙ্গসংখ্যয়োঃ॥

ফলে সুন্দরী কন্যা, চন্দ্রো দ্রষ্টব্যঃ ইত্যাদি প্রয়োগের পাশাপাশি "বাতাঃ পাতুং শক্যম্", "যুক্তমস্যাভিলাষঃ অভিনন্দিতুম্" (শকুন্তলা) ইত্যাদি প্রয়োগও দেখা যায়।

[আরও বিস্তৃত উদাহরণসমূহের জন্য লিঙ্গানু-শাসন, সিদ্ধান্তকৌমুদী/ ব্যাকরণকৌমুদীর শেষাংশে দ্রষ্টব্য]

1972

(a) **Write short notes on the following :—**
(i) **Grimm's Law** (ii) **Verner's Law.**
পৃঃ ১২০-১২২ দ্রষ্টব্য।

(b) **Write a note on the affinities between Vedic Sanskrit and Avesta.**
1967-এর (৮) ও 1969-এর Q. (a) দেখ।

(c) **What do you understand by families of language ? Discuss.**
1967-এর Q. (b) দেখ। 'ভাষার শ্রেণীবিভাগ' অধ্যায়টির পরিবেশন প্রয়োজন।

(d) **Trace the history of the evolution of Comparative Philology as a science.**
1969-এর Q. (c) দেখ।

(e) **Determine the extent of Non-Aryan influence on Sanskrit with apt illustrations.**
1966/1967-এর Q. (d) দেখ।

1973

(a) State Grassman's Law and illustrate the same.

পৃঃ ১২৩-তে গ্রাস্‌মানের সূত্র দেখ।

(b) Discuss the relation of Prākrit and Sanskrit. Mention the different types of Prākrit words with illustrations.

'ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর'—অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও মধ্য-ভারতীয় আর্যের বৈশিষ্ট্যাবলী অবলম্বনে আলোচনা প্রয়োজন।

(c) What is meant by the Indo-Iranian group of languages? Explain its peculiarities.

'ইন্দো—ইরাণীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য' অধ্যায় দেখ।

(d) What is 'assimilation' in Linguistics? Give suitable examples.

(e) Discuss the origin of writing in India.

'ভারতীয় লিপি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

1974

(a) Write short notes on any two of the following :—

(i) Grimm's Law (ii) Metathesis (iii) Haplology.

(i) পৃঃ ১২০, (ii) পৃঃ ১৩২, বর্ণবিপর্যয়, (iii) পৃঃ ১৩৪, সমাক্ষরলোপ

(b) Write a short note on the families of language.

1967-এর Q. b/1972-র Q. (iii) দ্রষ্টব্য।

(c) Write a note on the Non-Aryan influence on Sanskrit with suitable examples.

1966/1967-এর Q. (d), 1972-র Q. (v) দেখ।

(d) Show the main difference between Vedic and Classical Sanskrit.

1976-এর Q (c), 1968-এর Q (c), 1971-এর Q (a) দেখ।

(e) Show the characteristic features of Centum and Satəm groups of languages with illustrations.
1968-এর Q (d) দেখ।

1975

(a) Show that there were dialectal variatious in Sanskrit.
'কথ্য সংস্কৃত'-অধ্যায়ের ৭০-৭৪ পৃঃ দেখ। সেই সংগে যোগ ক'রতে হবে—পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে 'প্রাচাম্', 'উদীচাম্' পদ প্রমাণ করে সংস্কৃতের দুটি মুখ্য উপভাষা ছিল পূর্বী বা পূর্বদেশীয় এবং 'উদীচ্য' বা উত্তরপশ্চিমা।

(b) Give an account of mutual relations between Vedic language and Avestan.
1967-এর Q (b), 1969-এর Q (a) দেখ।

(c) What is a phonetic law? Discuss Grassman's Law with illustrations.
পৃঃ ১১৮ দেখ। ঐ ধ্বনিসূত্রের উল্লেখ ও উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিতে হবে (পৃঃ ১২৩)।

(d) What do you mean by IE family of languages? Discuss their classification.
দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদ এবং 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিভাগ' অধ্যায়ের প্রাথমিক বিভাগের বিশ্লেষণ পর্যন্ত সংক্ষেপে লেখনীয়।

(e) Write short notes on any two of the following :
(i) Assimilation, (ii) Anaptyxis, (iii) Epic Sanskrit, (iv) Ablaut.
(i) পৃঃ ১৩২ সমীভবন, (ii) পৃঃ ১৩৩ স্বরভক্তি, (iii) পৃঃ ৬৫-৬৯, (iv) পৃঃ ১২৫-১২৭ অপশ্রুতি।

1976

(a) **Describe the emergence of Indo-Aryan.**

পৃঃ ৩৪-এ 'ইন্দো-ইরাণীয়' ভাষার বৈশিষ্ট্যের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ ও পৃঃ ৪৯-এর প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ মিলিয়ে লিখতে হবে। আর্য (ই-ইরা.) ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথাও সামান্যভাবে বলা প্রয়োজন।

(b) **Institute a comparison between Vedic and Classical Sanskrit.**

পূর্বে আলোচিত।

(c) **Show that Verner's Law is a modification of Grimm's Law .**

পৃঃ ১২০, ১২২-তে উক্ত সূত্রদ্বয়ের বিশ্লেষণ দেখ।

(d) **Give a brief history of Writing in India.**

'ভারতীয় লিপি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(e) **Write short notes on any two of the following : Haplology, Epenthesis, Dissimilation, Accent**

পৃঃ ১৩৩, ১৩৪, ১৩২, ১৩৫ দ্রষ্টব্য।